মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা

[খিলাফত ও মুসলিম ভারত]

মাহবুবুর রহমান

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা

[খিলাফত ও মুসলিম ভারত]

মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা
এবং
সাবেক বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওয়েস্টার্ন কলেজ, ঢাকা।

নভেল পাবলিশিং হাউস
২/৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

নভেল দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

প্রকাশক : তরিকউল্লাহ তরুণ, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। ফোন : ০২-৯৫১১৩২৯, ৯৫৮৩৭৪৬, মোবাইল : ০১৭১৫৩৬২২২৬, ০১৭১১৬৭০৭৬০। প্রচ্ছদ : জাকির হোসেন। কম্পিউটার কম্পোজ : রঘুনাথ বসাক। মুদ্রণ : আল-কাদের প্রেস, ঢাকা। প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১২।

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র।

MUSALMANDER ITIHAS CHARCHA by, Mahbubur Rahman. Published by Tarikullah Tarun, Novel Publishing House, 2/3 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Phone : 02-9511329, 9583746, Mobile : 01715362226, 01711670760. Cover Design : Jakir Hossain. Computer Compose : Roghunath Basak. Copy right : Author. Date of Publication, July, 2012. Second Edition : February, 2014.

Price Tk. 200.00, US $ 10

ISBN– 984-70205-0056-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মুসলিম ইতিহাসচর্চা উন্নতিতে

যাঁরা অসামান্য অবদান

রেখে যাচ্ছেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা [খিলাফত ও মুসলিম ভারত]" গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ সত্যিই এ গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম "মুসলিম দর্শনের ইতিহাস এবং ইতিহাসচর্চা [খিলাফত ও মুসলিম ভারত]" নামে ২০১২ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (এম.এ) পাঠ্যসূচির কথা চিন্তা করে এবং বিভিন্নজনের কাছ থেকে পরামর্শ আসলে "মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা (খিলাফত ও মুসলিম ভারত)" নামে ২০১২ সালের জুলাই মাসে নতুন কলেবরে প্রকাশিত হয়। এর পর গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয় এবং গ্রন্থের সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। এর ফলে গ্রন্থটিকে ব্যাপকভাবে সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়।

এ বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই কঠিন বিষয় বলে মনে হয়। তাই খুবই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে **নভেল পাবলিশিং হাউস**-এর প্রকাশক, তরিকউল্লাহ তরুণ আগ্রহভরে এগিয়ে আসলে আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আশাকরি গ্রন্থটি আগের সংস্করণের মতো সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত হবে।

মাহবুবুর রহমান
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণ। ইতিহাসের জনক গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ – ৪২৫) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইতিবৃত্ত" লেখার মাধ্যমে ইতিহাস লেখার প্রচলন ঘটে। ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে আরবের বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। মদিনায় ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। মদিনায় প্রথম মহানবী (স) "মাগাজী" বা যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে কোরআন ও হাদিসকে উৎস করে ইতিহাসচর্চা হতো। কিন্তু ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র আব্বাসীয় আমলে (৭৫০ – ১২৫৮ খ্রি.) কুফা ও বসরাতে স্থানান্তরিত হবার ফলে এর বহুমাত্রিকতা আসে। পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করবার পর এর আরো বিকাশ লাভ করে। এভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইতিহাসের স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে ইতিহাস আধুনিক রূপ লাভ করে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (এম. এ) শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে মুসলিম ইতিহাসচর্চা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী এ বিষয়ে একটি বইও বাজারে নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছে। গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে মদিনায় ইতিহাসচর্চা শুরু থেকে, উমাইয়া ও আব্বাসীর আমলের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চা বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। আমিও আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছি। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও সাধারণ পাঠক ও গবেষকরা এ গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

যেসব গবেষকদের গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবি বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয়া হয়েছে। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশ করবার ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন এর মোরশেদ আলম সাহেব আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে।

গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তেজগাঁও কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল আলম, অধ্যাপিকা সুরাইয়া বানু, অধ্যাপক আলী আকবর হেলালীর কথা না বললেই নয়। তারা গ্রন্থটি নিখুঁতভাবে তৈরি করতে যথেষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

গ্রন্থটি অত্যন্ত কম সময়ে খুব দ্রুততার সাথে করা হয়েছে। তাই ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। গঠনমূলক সমালোচনা করলে অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

গ্রন্থটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। সাফল্যের ভার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

মাহবুবুর রহমান
বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওয়েস্টার্ন কলেজ, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড
[খিলাফত]

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় প্রথম :	ইতিহাস ও মুসলিম ইতিহাসচর্চার সংজ্ঞা, মুসলিম ইতিহাসের উৎস, মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিষয়বস্তু, মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশের স্তর	১৫
অধ্যায় দ্বিতীয়:	মুসলিম ইতিহাসচর্চার ধরন ও বিকাশ জীবনী ইতিহাস– মহানবী (স)-এর সিরাহ এবং মাগাজি– আল জহুরি, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, আল-ওয়াকিন্দি, ইবনে সাদ।	২৬
অধ্যায় তৃতীয়:	খবর এবং কুলজী বা বংশক্রম	৪৪
অধ্যায় চতুর্থ :	জাতীয় ইতিহাস আল-বালাজুরির "ফুতুহ আল-বুলদান" এবং "আনসাব-আল-আশরাফ।	৪৮
অধ্যায় পঞ্চম :	বিশ্ব ইতিহাস রচনা : আল ইয়াকুবি ও আল-তাবারি	৫১
অধ্যায় ষষ্ঠ :	মদিনা ও ইরাকি ইতিহাসচর্চা	৫৬
অধ্যায়-সপ্তম :	বিশ্লেষণ ধর্মী এবং উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস রচনায় বহুমাত্রিক পদ্ধতি আল-মাসুদি-খতিব আল বাগদাদী, ইবনে খাল্লিকান	৬১
অধ্যায় অষ্টম :	দরবারি ইতিহাস ও দরবারি ঐতিহাসিক : নিযাম-উল-মুলক তুসী	৬৯
অধ্যায় নবম :	ইতিহাসচর্চায় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা– ইবনে খালদুন : "আল মুকাদ্দিমা" এবং "কিতাব আল-ইবার	৭২

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড
[মুসলিম ভারত]

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় প্রথম	: ইন্দো-মুসলিম ইতিহাসচর্চা : চাচনামা, আল-বেরুনি "কিতাব-আল-হিন্দ," দিল্লির সুলতানি আমলে ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য	৮১
অধ্যায় দ্বিতীয়	: খাজা হাসান নিজামী	৯৪
অধ্যায় তৃতীয়	: মিনহাজ -ই-সিরাজ	৯৭
অধ্যায় চতুর্থ	: আমীর খসরু	১০৩
অধ্যায় পঞ্চম	: জিয়া-উদ-দীন বারানি	১০৮
অধ্যায় ষষ্ঠ	: শামস-ই-সিরাজ আফিফ	১১৬
অধ্যায়-সপ্তম	: ইবনে বতুতা	১১৯
অধ্যায় অষ্টম	: ইসামী	১২৯
অধ্যায় নবম	: মুঘল আমলের ইতিহাস রচনা বাবুর নামা, গুলবদন বেগম	১৩১
অধ্যায় দশম	: আবুল ফযল, নিজাম-উদ্দীন আহমদ বখশি, আব্দুল কাদের বাদাউনী	১৩৯
অধ্যায় একাদশ	: তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, আব্বাস খান শেরওয়ানি	১৪৯
অধ্যায় দ্বাদশ	: মির্যা নাথান, আবুল কাশিম ফিরিশতা	১৫৭

প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় প্রথম	: গোলাম হোসেন সলিম	১৬৩
অধ্যায় দ্বিতীয়	: গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি	১৬৯
অধ্যায় তৃতীয়	: মুন্‌সি সলিম উল্লাহ	১৭৩
গ্রন্থপঞ্জি	:	১৭৪

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড
খিলাফত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস ও মুসলিম ইতিহাসচর্চার সংজ্ঞা, মুসলিম ইতিহাসের উৎস, মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিষয়বস্তু, মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশের স্তর

ইতিহাসের সংজ্ঞা

সাধারণত ইতিহাস বলতে আমরা অতীতে ঘটে যাওয়া যে কোনো ঘটনার বিবরণকে বুঝে থাকি। 'ইতিহাস' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'ইতিহ' শব্দ থেকে এসেছে। 'ইতিহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ঐতিহ্য'।

ইংরেজি "History" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো "ইতিহাস"। এ "History" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Histor' (জ্ঞান) ও গ্রিক শব্দ 'Historia' (অনুসন্ধান) শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান, গবেষণা, পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন বৃত্তান্ত (Past events)। ইতিহাসের জনক গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Histories"-এ "History" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ইতিহাস বলতে আমরা এমন একটি বিষয়কে বুঝি যা অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিকে সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা বা অনুসন্ধান চালিয়ে সত্য উপস্থাপন করা। আবার এ-ও বলা যায় যে, মানুষ ও তার গড়া সভ্যতার যাবতীয় বিষয় উপস্থাপনই হলো ইতিহাস। আধুনিক পণ্ডিতরা তিনটি শব্দ দিয়ে ইতিহাসের পুরো ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন। তা হলো Man + time + Place = মানুষ + কাল + স্থান। অতএব, ইতিহাস হচ্ছে অতীতের সমস্ত ঘটনা সুন্দরভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা।

ইংরেজি 'History' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা উপরের বিষয়টির সাথে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। যেমন–
H– Human (মানুষ), I– Investigation (অনুসন্ধান), S– Society (সমাজ), T– Truth (সত্য), O– Origin (উৎস), R– Record (বিবরণ), Y– Yore (প্রাচীনকাল বা অতীত)। অর্থাৎ ইতিহাস বলতে বোঝায় অতীত সমাজের মানুষের কর্মকাণ্ডের উৎসভিত্তিক সত্য বিবরণ যা থেকে গবেষণা বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায়।

www.pathagar.com

ইতিহাসের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

(১) World Book– Encyclopedia-তে ইতিহাসের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া আছে, "History is the study of the past. "অর্থাৎ, ইতিহাস হচ্ছে অতীত কালের অধ্যয়ন।"

(২) Chambar's Encyclopedia তে বলা আছে, "History is the study a man in time." অর্থাৎ "মানুষের কালক্রম অধ্যয়নই ইতিহাস।"

(৩) R.G Collingwood বলেন, "History is an inquiry about the actions of human being that have done in the past" অর্থাৎ "অতীত কালের মানুষের কৃত কার্যাবলি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের নামই ইতিহাস।"

(৪) Encyclopedia Britannica তে বলা আছে, "History is the past experience society." অর্থাৎ "ইতিহাস হচ্ছে অতীত সমাজের অভিজ্ঞতা।"

(৫) ব্যাপসন মনে করেন যে, "ঘটনার ধারাবাহিক ও বৈজ্ঞানিক বিবরণই ইতিহাস।"

(৬) ঐতিহাসিক ই. এইচ. কার (Edward Hallett Caar) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "What is History" নামক গ্রন্থে বলেন, "বর্তমান ও অতীতের মধ্যে চিরকাল ধরে যে সংলাপ চলছে তাই হচ্ছে ইতিহাস।"

(৭) ঐতিহাসিক বি. ডি. গেটে (B. D. Ghate) বলেন, "It is a scientific study and record of our complete past." অর্থাৎ "ইতিহাস হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ এবং মানব জাতির সম্পূর্ণ অতীতের একটি জীবন্ত প্রমাণ চিত্র।"

(৮) ইতিহাসের জনক গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস বলেন, "ইতিহাস হলো অতীত ঘটনার সত্য ও সুন্দর বর্ণনা।"

(৯) আরবি শব্দ 'তারিখ' ইতিহাসের প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। 'তারিখ' শব্দটি 'আরখ' মূল ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ হলো কোনো ঘটনার সময় নির্ণয় করা। তাহলে 'তারিখ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যে, ঘটনার কালক্রম অনুযায়ী মানব সমাজের বিষয়গুলো সুন্দর করে সাজানো।

(১০) উনিশ শতকে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Freeman ইতিহাসকে 'Past Politics' বলেছেন।

(১১) সংস্কৃত অলংকারিকরা ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ইতি হ আস" অর্থাৎ 'এই রকমই ছিল।'

www.pathagar.com

ইতিহাসের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

এখন আমরা ইতিহাসের একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করতে পারি। ইতিহাস হচ্ছে মানব সমাজের অতীতের সমস্ত কার্যাবলির বিবরণ।

মুসলিম ইতিহাসচর্চার সংজ্ঞা

ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসচর্চার শুরু। ইংরেজী "Historigraphy" ও "History writing" শব্দগুলো দিয়ে এবং আরবি শব্দ "ইলম-আল-তারিখ" দিয়ে ইতিহাসচর্চার ধারণা লাভ করা যায়। কোন কিছু ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে হলে প্রয়োজন পড়ে তথ্য সংগ্রহের। তারপর সে সব তথ্য যাচাই বাছাই করে তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখতে হয়।

মুসলিম ইতিহাসের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি, ইসলামের আর্বিভাবের সময় থেকে শুরু করে মুসলিম শাসন ও সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তিকালীন সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন ও ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধানের কলাকৌশলকে।

মুসলিম ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার সূত্র আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পাই। যেমন– পবিত্র কোরআন, হাদিস, তাফসির, সরকারি দলিল পত্র, প্রাক-ইসলামী কাহিনী, কবিতা, কুলজী, বাইবেল, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে। এখন আমরা মুসলিম ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে নিম্নে আলোচনা করব।

(ক) পবিত্র কোরআন

১. ঐশী গ্রন্থ হিসেবে

মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস হলো আল কোরআন। এটি হলো ঐশী গ্রন্থ।[১] আল-কোরআনের পথম শিক্ষা হলো "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এর থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো কোরআন পড়া, বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পড়া মুসলমানদের কর্তব্য। এভাবে মূলত মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার চেতনা জাগ্রত হয়।

২. কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার আগে থেকে হযরত আদম (আ) ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কোরআন অবতীর্ণ হবার পর ইসলাম ধর্ম আরবে দ্রুত বিস্তার লাভ

---

১. *"কুরআন সংকলনের ইতিহাস" মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ ঢাকা-২০০০।*

www.pathagar.com

করতে থাকে। কোরআন যখন ওহীর মাধ্যমে মহানবী (স)-এর কাছে অবতীর্ণ হত তখন তা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে এবং এ কোরআন সংগ্রহ ও সংকলনের সময় মুসলমানরা ইতিহাসচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩. অতীতের বিবরণ লিপিবদ্ধ

আল কোরআনে অতীত জাতিসমূহের খোদাদ্রোহিতার পরিণাম এবং আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের আত্মত্যাগের যে বিবরণ এসেছে তা মুসলমানদেরকে ইতিহাসচর্চা ও তা রচনায় উৎসাহিত করেছে। পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে ইসলামের পথে আনার জন্য নবী, রাসূলদেরকে যে কত দুঃখ, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তার সঠিক চিত্র আল কোরআনে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে গোটা মানবজাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে। নমরুদ, ফেরাউন, সাদ্দাদ প্রভৃতির চরম পরিণতির কথা, আদ, সামুদ, বনি ইসরাঈল, হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত সোলায়মান (আ) প্রভৃতি নবীর কথা কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং তাদের ভুল ভ্রান্তির কথাও আছে। এসব বিবরণ থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটাতে কোরআন প্রত্যক্ষ উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪. শিক্ষা দান

পবিত্র কোরআন হলো মুসলিম ইতিহাসচর্চার প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। কোরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করে মানুষ তাদের জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়। এ কারণে মুসলিম ঐতিহাসিকরা ইতিহাসচর্চায় মনোযোগী হয়।

৫. সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান দান

কোরআনে আল্লাহ মানুষদেরকে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে তাগিদ দেয়। এ তাগিদের কারণে মুসলমানরা ইতিহাসচর্চায় উৎসাহিত হয়েছে।

৬. আরবি ব্যাকরণের জন্ম

কোরআন অবতীর্ণ হবার পর তার ভাষা সকলের কাছে বোধগম্য হবার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় আরবি ব্যাকরণের। এ জন্য মুসলমানরা আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন, অভিধান রচিত হয়, যা মুসলমানদেরকে ইতিহাসচর্চায় উৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

৭. অপূর্ব লিখন পদ্ধতি ও রচনা শৈলী

আল-কোরআন রচনা শৈলী হলো অপূর্ব। এর লিখার পদ্ধতি এমন যা কখনো অনুকরণ করা সম্ভবপর নয়। কোরআনের ভাষা ছন্দময় ও অলংকারপূর্ণ। ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, "কোরআনের বিশুদ্ধ ভাষা ও মনোরম রীতি কোন মানব প্রতিভার পক্ষে অনুকরণ বা রচনা করা সম্ভবপর নয়।"[২] কোরআনের বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা করতে গিয়ে মুসলমানরা ইতিহাসচর্চা শুরু করে।

৮. মুসলমানদের সামগ্রীক জীবন পদ্ধতি

এ কোরআন শুধু ধর্মীয় বিধান নয় বরং এতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিধানও আছে। এ কোরআন জীবনের সব সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান দেয়। এ ছাড়া কোরআনে শাসনতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলি, নাগরিকদের অধিকার, কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছে। পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক নীতির কথা বলা হয়েছে। আর এগুলো নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করতে গিয়ে মুসলিমরা কোরআনকে অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোরআন হলো মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস।

(খ) আল হাদিস

মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস হলো : আল-হাদিস। মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেই হাদিস বলে।[৩]

১. মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান

মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান হলো হাদিস। হাদিস মুসলিম আইনের দ্বিতীয় উৎস। ইসলামের যাবতীয় সব অনুশাসন, দুনিয়া, আখিরাত, মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছু হাদিসে আছে। মহানবী (স)-এর জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের বিবরণ হাদিসে আছে। হাদিসকে একদিকে যেমন মুসলিম আইনের উৎসও বলা যায় ঠিক আবার তেমনিভাবে মহানবী (স)-এর নির্ভরযোগ্য জীবন চরিতও বলা যায়। মুসলিম আমলে প্রাথমিক যুগে হাদিস বেত্তাদের দ্বারাই মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়।

---

২. *"আরবি সাহিত্যের ইতিহাস" নিকলসন কোলকাতা-২০০৩।*

৩. *"হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত" অধ্যাপক ড. আহসান সাঈয়েদ ঢাকা-২০০৮। "হাদীস সংকলনের ইতিহাস" মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঢাকা-২০০৭।*

www.pathagar.com

২. সমসাময়িক ঘটনাবলি

বিভিন্ন হাদিসে মহানবী (স)-এর সমসাময়িক ঘটনাবলির যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে মুসলিম জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধারণার বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞান লাভ করা যায়। হাদিস ইতিহাস নয়। কিন্তু, এ হাদিস ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস।

৩. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

মহানবী (স)-এর হাদিস রচনা করবার আগে হাদিস সংগ্রহকরা হাদিস বর্ণনাকারীদের চরিত্র, সততা, সত্যনিষ্ঠতা, আদর্শ যাচাই করে হাদিসের সত্যা সত্য যাচাইয়ের যে চেষ্টা করেছেন তা পরবর্তীকালে মুসলিম ইতিহাসচর্চার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এর থেকে নির্ভুলভাবে ইতিহাস রচনা করতে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করে। ফলে হাদিস মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

৪. প্রাক-মুসলিম আমলে আরব গণজীবনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে

প্রাক-ইসলামী আমলের গণজীবনের ইতিহাস হাদিসেও পাওয়া যায়। এতে কেবল প্রাক-ইসলামী যুগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথাই না বরং পুরো গণজীবনের কথাই জানা যায়।

(গ) তফসির

তফসিরও মুসলিম ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস। কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তফসিরের মাধ্যমে করা হয়। আর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সঠিক ইতিহাস নির্ণয়ে সহায়তা করে। আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) সর্বশ্রেষ্ঠ তফসিরবিদ ছিলেন আবদুল্লাহ-ইবনে-আল-আব্বাস (মৃ. ৭০হি.)।

(ঘ) সরকারি দলিল, সন্ধি ও চিঠি পত্র

সরকারি দলিল, সন্ধি ও চিঠি পত্র মুসলিম ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস। মহানবী (স) প্রথমে আমর বিন-হাজমকে ইয়েমেনের গভর্নর ও পরে মুয়াজ-আল-জাবালকে যখন সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠান তখন তিনি তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিতেন সে নির্দেশনা পরবর্তীতে ইতিহাসের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (স)-এর বিভিন্ন চুক্তি, হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) ছিল মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম উৎস। উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ লিখিত হয়। এ সব গ্রন্থ ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস ছিল।

www.pathagar.com

(ঙ) কবিতা, কাহিনী

প্রাক-ইসলামী আরবে আরববাসীদের মুখে মুখে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনা আরব সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে কবিতা ছিল আরব জীবনের সম্পদ। এসব কবিতায় তৎকালীন আরবদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। গোত্রীয় শৌর্য-বীর্য ও প্রেম ছিল তখনকার কবিতার বৈশিষ্ট্য। মুসলিম আমলে ইবনে ইসহাক তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি কবিতার আশ্রয় নেন বেশি।

(চ) মুদ্রা, শিলালিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

মুদ্রা, শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন হলো মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস। মহানবী (স)-এর সীলমোহর, বদরের যুদ্ধে ব্যবহৃত হযরত ওমর (রা)-এর তরবারি, খালিদ-বিন-ওয়ালিদের তরবারি, মহানবী (স)-এর তরবারি, মদিনায় প্রতিষ্ঠিত মহানবী (স)-এর "মদিনা মসজিদ," হযরত ওসমান (রা)-এর রক্তমাখা কোরআনের কপি, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে নির্মিত বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা সমাধি ক্ষেত্র, বিভিন্ন স্থাপত্যিক নিদর্শন, মুদ্রা ও শিলালিপি হলো মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উৎস।

কাজেই বলা যায় যে, আমরা মুসলিম ইতিহাস রচনার উৎস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাই। এসব উৎস মুসলিম ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট অবদান আছে।

মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিষয়বস্তু

মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইতিহাস হচ্ছে মানব জীবনের অতীত কার্যাবলি। অতীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

১. হাদিস

ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলিম ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। হাদিস বেত্তাদের হাত ধরেই মুসলিম ইতিহাসচর্চার শুরু হয়। হাদিসের মাধ্যমে আমরা শুধু মহানবী (স)-এর বাণীই পাইনা বরং সে সময়ের আরবের এক জীবন্ত ইতিহাস আমরা পাই। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ ঐতিহাসিক তাবারির সময় থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা হাদিস থেকে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করে। পরবর্তীতে হাদিস মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

২. জীবন চরিত জাতীয়

জীবন চরিত (Biography) মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম বিষয় বস্তু। মহানবী (স)-এর হাদিস লেখার সময়ে জীবন রচিত লেখার সূত্রপাত ঘটে। এ জীবন

www.pathagar.com

চরিতের ধারা পরবর্তীকালে বিশ্ব ইতিহাস পরিণত হয় ইবনুল আসীর মাসুদি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের হাতে। ঐতিহাসিক মাসুদি আবার সমাজমুখী ইতিহাসচর্চার সূচনা করেন। ইবনে খালদুনের হাতে তা পরিণত রূপ লাভ করে। জীবন চরিত ইতিহাসের মধ্যে ইবনে ইসহাকের "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)' ইবনে হিসামের " "সীরাতুন নবী (স)" ছিল উল্লেখযোগ্য।

৩. বিভিন্ন জাতির ইতিহাস

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মুসলিম ইতিহাসচর্চার অন্যতম বিষয়বস্তু। মুসলিম ঐতিহাসিকরা যে কেবল মুসলিম জাতির ইতিহাসই রচনা করেছেন তা নয়। বরং তারা এ ইতিহাসকে বিশ্ব ইতিহাসে পরিণত করেন। ঐতিহাসিক মাসুদির সময়ে মুসলিম ও অ-মুসলিম সকল জাতির ইতিহাস স্থান পায়। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিষয়বস্তু ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৪. ভূগোল ভিত্তিক

ঐতিহাসিক ইয়াকুবি ভূগোল ভিত্তিক ইতিহাসের যে সূচনা করেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিক মাসুদির লেখায় ও ভূগোল ভিত্তিক বিবরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার বর্ণনায় আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থানসমূহের বিবরণ দেখা যায়। ইবনে খালদুনের বিবরণেও ভূগোল ভিত্তিক বিবরণ দেখা যায়।

৫. তারিখ বা বংশ ভিত্তিক ঘটনাবলি

দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ইতিহাস লিখিত হত সাল তারিখকে কেন্দ্র করে। তাই ইতিহাসকে তখন "তারিখ" বলা হত। ঐতিহাসিক মাসুদির সময় থেকে বংশভিত্তিক ইতিহাস লেখা শুরু হয়। তখন থেকে বংশ ভিত্তিক ইতিহাস (Dynastic History) ধারার প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানেও আমরা তা লক্ষ্য করছি। এ বংশ ভিত্তিক ইতিহাস লেখা ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু।

৬. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। হাজার বছরের বাড়ি ঘর মসজিদ, প্রাসাদ, মুদ্রা, শিলালিপি, প্রস্তর লিপি ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যেমন– মদিনা মসজিদ, বায়তুল মোকাদ্দাস, ইবনে তুলুনের মসজিদ, উমাইয়া আমলের স্থাপত্য কর্ম ও আব্বাসীয় আমলের স্থাপত্য কর্ম-প্রভৃতি ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

৭. সভ্যতার ক্রমবিবর্তন

সভ্যতার ক্রম-বিবর্তন মুসলিম ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের অবসান ঘটে কি করে আরব সমাজে এক নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটে তা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর এ মুসলিম সভ্যতা আজ কি করে এত উন্নত সভ্যতায় পরিণত হলো তা ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

৮. ধর্মীয় ক্রমবিকাশ

ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, বিভিন্ন নবী ও রাসূলের আগমন এবং বিভিন্ন নবীর অনুসারীরা ইহুদি, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে যাওয়া মুসলিম ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মদ (স) পর্যন্ত পৃথিবীর সব নবীর কর্মকাণ্ড ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

৯. লেখক ও তাদের কর্ম

বিভিন্ন লেখক ও তাদের কর্ম ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যেমন– ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুকাদ্দিমাতে" একদিকে যেমন ইতিহাসের দর্শন আরেকদিকে সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ইয়াকুবি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ইতিহাসের ভৌগোলিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক মাসুদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ইতিহাস রচনা করেন। তাকে "মুসলিম ইতিহাসের হিরোডোটাস" বলা হয়। এভাবে বিভিন্ন লেখকদের কর্ম ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কারণ এসব ঐতিহাসিকদের তথ্য সংগ্রহ করে আধুনিক ঐতিহাসিকরা তাদের রচনা পুনঃনির্মাণ করতে পারেন।

১০. উত্থান-পতন

পৃথিবীর সূচনা থেকে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়, জাতি, বংশ, সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন মুসলিম ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কি করে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতি, বংশের উত্থান ও পতন ঘটেছে তা ইতিহাস পাঠের মাধ্যমেই জানা যায়। বিশ্বের সব শাসক ও রাজবংশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার শেষ হয়েছে তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যেমন– উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, স্পেনে উমাইয়া খিলাফত, বার্মাকি বংশ, সেলজুক বংশ, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রভৃতি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

১১. যুদ্ধ, সন্ধি

যে কোন যুদ্ধ বা সন্ধি ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কারণ এসব যুদ্ধ, সন্ধি থেকে সে সময়কার জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। যেমন– বদরের যুদ্ধ, (৬২৪খ্রি) ওহুদের যুদ্ধ (৬২৫খ্রি) যাবের যুদ্ধ (৭৫০খ্রি.), মারজ-ই-দাবিকের যুদ্ধ (১৫১৭ খ্রি.), হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮খ্রি.) প্রভৃতি ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশের স্তরগুলো–

মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশের স্তরকে আমরা ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন–

(১) প্রথম স্তর (৬৩২ – ৬৬১ খ্রি.)

(২) দ্বিতীয় স্তর (৬৬১ – ৭৫০ খ্রি.)

(৩) তৃতীয় স্তর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ও

(৪) চতুর্থ স্তর (১২৫৮ – বর্তমান সময় পর্যন্ত)।

এখন নিম্নে এ স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. প্রথম স্তর (৬৩২ – ৬৬১ খ্রি.)

মদিনায় ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র স্থাপনের সাথে সাথে মুসলিম ইতিহাসচর্চার প্রথম স্তর শুরু হয়। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল মহানবী (স)-এর জীবনী লিখা ও তার সময়ে যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা লেখা। অর্থাৎ "মাগাজী" চর্চা হত বেশি। এখানে কোরআন ও হাদিস থেকে উদ্ধৃত দেয়া হত বেশি। এ সময়টা ছিল একদম প্রাথমিক স্তর। অনেক সময় ঐতিহাসিকরা তাদের রচনায় কবিতার ব্যবহার করত। আরো উল্লেখ করত "বর্ণনাকারীর মতে, "কিংবা" অমুক গোত্র" বা "গোত্রের কোন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত" শব্দ। তবে উমাইয়া সময়ে (৬৬১ – ৭৫০ খ্রি.) খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ইতিহাসচর্চার সাথে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২. দ্বিতীয় স্তর (৬৬১ – ৭৫০ খ্রি.)

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার সাথে উমাইয়া সময়ের ইতিহাসচর্চার বেশ পার্থক্য ছিল। উমাইয়া সময়ে ইতিহাসচর্চা শুধু "মাগাজী" ভিত্তিক বা মহানবী (স)-এর "সিরাহ" অর্থাৎ জীবনী ভিত্তিক ছিলনা। উমাইয়া আমল ছিল মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ। বিভিন্ন দেশে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজধানীতে তথ্য প্রেরণ হতে থাকে। এ সব সরকারি দলিল থেকে ঐতিহাসিকেরা তাদের লেখার কিছু কিছু তথ্য ব্যবহার করে। আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। উমাইয়া আমলে আমরা আবার প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চার সাথে সাথে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চাও দেখি। এ সময়ে মুসলিম ইতিহাসচর্চা শিশু কাল অতিক্রম করে যৌবন প্রাপ্ত হতে থাকে।

www.pathagar.com

৩. তৃতীয় স্তর (৭৫০ – ১২৫৮ খ্রি.)

আব্বাসীয় আমল ছিল মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশের স্বর্ণ যুগ। এ সময়ে মুসলিম ইতিহাসচর্চা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আসে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেমন বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বকোষ রচনা করে। বংশ ভিত্তিক ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি খবর ভিত্তিক ইতিহাসচর্চার প্রচলন ঘটে। অাখবারি ঐতিহাসিকরা সরকারি দলিল তাদের ইতিহাসে ব্যবহার করে অকাতরে। মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার রীতি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে আখবারি ঐতিহাসিকরা এ ইতিহাসচর্চাকে আধুনিক রূপদান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা মদিনার ইতিহাসচর্চা থেকে শুরু করে উমাইয়া আমলের ইতিহাসচর্চার অনেক রীতি-নীতি সংশোধন করে ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা আনে। আব্বাসীয় আমলের ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন তথ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাদের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে সে সব দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিতেন।

৪. চতুর্থ স্তর (১২৫৮ বর্তমান সময়)

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল বীর বর্বর হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ ও ধ্বংস সাধন করে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটান। এর ফলে মুসলিম খিলাফত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। মুসলিম ইতিহাসচর্চার ক্রমবিকাশ এ স্তরটি ছিল আধুনিক স্তর। এ সময়ে দরবারি ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি স্বাধীন ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব ঘটে। তারা ইতিহাস রচনায় এক নতুন পদ্ধতি আনেন। তথ্য উপাত্ত ছাড়াও তারা নিজস্ব মতামত দিয়ে ইতিহাস রচনা করেন। এতে করে মুসলিম ইতিহাসচর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম ইতিহাসচর্চার ধরন

সিরাহ

"সিরাহ" আরবি শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো "জীবনী" বা "চরিত ইতিহাস"। এজন্য যে কোন জীবনীমূলক রচনাকে "সিরাহ" অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ব্যবহারিক অর্থে সিরাহ

ব্যবহারিক অর্থে সিরাহকে মহানবী (স) ও তার সাহাবীদের জীবনীকেই বুঝায়। ইসলামের প্রাথমিক সময়ে সিরাহ মহানবী (স)-এর জীবন চরিতকেই বোঝাত। সিরাহকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। যেমন–

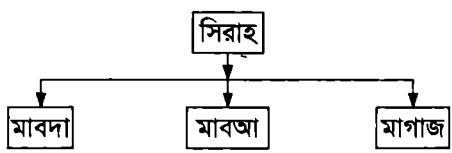

মাবদা অংশে আমরা দেখি পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে মহানবী (স)-এর শৈশব কাল পর্যন্ত সময়। এই সাথে মহানবী (স)-এর বংশের তালিকাসহ বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলি এতে আছে। মাবআস অংশে মহানবী (স)-এর ওহী প্রাপ্তির পর থেকে মক্কা জীবন অর্থাৎ হিজরতের আগে পর্যন্ত আছে। মাগাজী অংশে আমরা দেখি মহানবী (স)-এর মদিনা জীবনের সমস্ত সামরিক অভিযান সম্পর্কে। সিরাহ সাহিত্য আমরা দেখি যারা মহানবী (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা পেত। তাই মহানবী (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একটি তালিকা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুরহাবিল-বিন-সাদ-এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মুসা-বিন-উকবা সর্ব প্রথম একটি তালিকা তৈরি করেন।[১] সামাজিক সম্মানের কারণে আবার

---

১. *"মুসলামনদের" ইতিহাসচর্চা [খিলাফত ও ভারত উপমহাদেশ]* ড. এ.কে. এম ইয়াকুব আলী ও ড. রুহুল কুদ্দুস মো: সালেহ ঢাকা-২০০৮।

www.pathagar.com

অনেক আরব নেতা তাদের পরিবারকে "বদর" বা "ওহুদের" যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী হিসেবে অনেক 'সিরাহ" বা "মাগাজী" বর্ণনাকারীদেরকে ঘুষ দেন। হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সিরাহ সাহিত্যের উৎপত্তি ও এর বিকাশ ঘটতে থাকে।

মাগাজী

"মাগাজী" আরবি শব্দ। মাগাজী শব্দটি "মাগজা" শব্দের বহু বচন। মাগাজী শব্দের অর্থ হলো সামরিক অভিযান। মূলত মহানবী (স)-এর সামরিক অভিযানকে মাগাজী বলা হয়।

মাগাজী সারিয়াহ ও গাযওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেসব সামরিক অভিযানে মহানবী (স) নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে গাযওয়া বলা হত। আর যেসব সামরিক অভিযানে মহানবী (স) অন্য কাউকে নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাতেন তাকে সারিয়াহ বলে। আল-ওয়াকিন্দীর মতে, মহানবী (স)-এর মাগাজীর সংখ্যা ৭৪টি।

মাগাজীর প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিক বার্নড লুইস বলেন, "এসব মাগাজী সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের পিছনে মুসলিম জাতির বীরত্ব ও কৃতিত্বের গর্ববোধ ছিল। মুসলমানদের মনে যেমন ছিল প্রাক-ইসলামী আমলের আরবদের মনে তৎকালীন গোত্রসমূহের কার্যকলাপের গর্ববোধ।" এছাড়াও আমরা দেখি মুসলমানদের নামের তালিকা বিশেষ করে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের নামের তালিকা, কখন কারা কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন সে অনুযায়ী নাম লিপিবদ্ধ থাকত। এর প্রধান কারণ ছিল আগে ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাষ্ট্রীয় বৃত্তির তারতম্য ঘটতো। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তারিখ থেকে এ বৃত্তি প্রদান শুরু হত। বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলিমদের মান মর্যাদা বেশি ছিল। অর্থাৎ মহানবী (স)-এর জীবন চরিত ও সমসাময়িক কালের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাগাজী।

মাগাজীর লেখকগণ

মাগাজী লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবান-বি-ওসমান (মৃত্যু ৭২৩ খ্রি.– ১০৫ হিজরি), উরওয়া বিন-যুবাইর-বিন-আল আওয়াম (মৃ: ৭১০ খ্রি.-৯২ হি), শুহরাবীল-বিন-সাদ (মৃত্যু ৭৪০ – ১২৩ হিজরি), ওয়াহাব-বিন-মুনাবিবহ (মৃত্যু ৭২৮ – ৭৩২ খ্রি. ১১০ – ১১৪ হিজরি), আবদুল্লাহ-বিন-আবুবকর-বিন-হাযম (মৃত্যু ৭৪৭ – ৭৫২ খ্রি. – ১৩০ – ১৩৫ হিজরি) মুহাম্মদ-বিন-মুসলিম-বিন-সিহাব-আল যুহরি (মৃ: ৭৪১ খ্রি.-১২৪ হিজরি) মুসা-বিন-উকবা (মৃত্যু ৭৫৮ খ্রি. ১৪১ হিজরি), মুহাম্মদ-বিন-ওমর-আল ওয়াকিন্দী (মৃত্যু ৮২৩ খ্রি. ২০৮

www.pathagar.com

হিজরি), মুহাম্মদ বিন-ইসহাক (মৃত্যু ৭৬৭ খ্রি.) ১৫০ হিজরি), আল আনসারি, আল-বালাযুরী প্রমুখ। এখন নিম্নে কয়েকজন সিরাহ ও মাগাজী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আল যহুরি

পরিচয়

প্রখ্যাত মাগাজী লেখক আল যহুরি ছিলেন পবিত্র নগরী মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তার পুরো নাম হলো আবু বকর মুহম্মদ বিন-মুসলিম-বিন-উবায়দুল্লাহ বিন-আবদুল্লাহ-বিন-শিহাব-আল-যহুরী। ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয়। তিনি ইতিহাসচর্চার একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইতিহাস পাঠের একটি রূপ রেখা তৈরি করেন। তিনি মহানবীর (স) থেকে শুরু করে উমাইয়া আমল পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য মদিনা ছাড়াও তৎকালীন বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করেন। তিনি অধ্যয়নের জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময় মদিনায় কাটান। ফিলিস্তিনের দক্ষিণে হিজায সীমান্তে 'উদামা' নামক স্থানে বসবাস করার পর তিনি দামেস্কে যান এবং সেখানে তিনি উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ও হিশামের সময় সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তার স্মরণ শক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি ৭জন ফকীহর কাছ থেকে আইন অধ্যয়ন করেন। তার সম্পর্কে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন-আবদুল আজিজ (৭১৭ – ৭২০ খ্রি.) বলতেন, "ইবনে শিহাবের মতামত গ্রহণ কর, কারণ তার মত আর কেউ হাদীস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।" তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিস বেত্তাও ছিলেন। তিনি মহানবী (স)-এর ১০ জন সাহাবীকে দেখেছিলেন। তাদের কাছ থেকে তিনি হাদিস গ্রহণ করেছিলেন।

হজ্জ্ব পালন

তিনি মক্কায় পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। সেখানে তাঁর সাথে দেখা হয় বিখ্যাত সিরাহ ও মাগাজী লেখক ইবনে ইসহাকের সাথে।

যহুরির ইতিহাস রচনা

যহুরির ইতিহাসচর্চায় মহানবী (স)-এর মাগাজী ও সিরাহ প্রাধান্য পেয়েছে। যহুরির সৌভাগ্য হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ও উমাইয়া যুগ প্রত্যক্ষ করা। তাই তিনি তার লেখায় খোলাফায়ে রাশেদীনের ও উমাইয়া খিলাফতের বর্ণনা একদম নির্ভুলভাবে দিতে সক্ষম হন। যহুরি তার মাগাজী গ্রন্থের সূত্র হিসেবে উরওয়াহ বিন-যুবাইয়ের তথ্য গ্রহণ করেছেন। এর পর তিনি সাঈদ বিন-মুসায়য়ার এবং উবায়দুল্লাহ-বিন উতবার কাছ থেকে অধিক সংখ্যক রেওয়াত গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য পণ্ডিতের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

যহুরির রচনা শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত নূহ (আ), হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত মুসা (আ)-এর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলি দিয়ে।-এর সাথে এসেছে মহানবী (স)-এর জন্ম থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলির ধারাবাহিক বিবরণ। আকাবার শপথের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। সেই সাথে তিনি মক্কা থেকে মহানবী (স)-এর হিজরতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মহানবী (স)-এর মদিনা জীবনে তিনি তার অভিযানসমূহ, যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, মদিনার সনদ, মদিনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে দূত ও প্রতিনিধি প্রেরণ, মহানবী (স)-এর অসুস্থতা ও ইন্তেকাল আলোচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ঘটনার তারিখ ও সময় উল্লেখ করেছেন। তার লেখাতে কিছু উপাখ্যান বা কাহিনীও এসেছে। যেমন– নতুন ধর্ম সম্পর্কে হেরাক্লিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গির সংবাদ, শয়তান কর্তৃক জ্যোতিষিকে ভয় প্রদর্শনের কাহিনী প্রভৃতি হলো উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন কুলজিবিদও ছিলেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর জাতীয় জীবনে সংঘটিত ঘটনা, হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তিনি খুব নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা)-এর আমলের বিস্তারিত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। "তারিখ-আল-খুলাফা" নামক গ্রন্থে তিনি হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সময়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত ওসমান কর্তৃক কোরআন সংরক্ষণ ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-এর নির্বাচন, হযরত তালহা (রা) ও যুবাইর (রা)-এর বিবি আয়েশা (রা) তাদের সাথে যোগদান এবং সিফফিনের যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর হযরত আলী (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এরপর হযরত হাসান ও হোসেন (রা)-এর কথাও আছে।

তিনি এত বেশি পড়াশুনা করতেন যে, একবার তাঁর স্ত্রী তার উপর প্রচণ্ড রাগ করে বলেছিলেন," তোমার এ বইগুলো আমাকে তিন সতীনের চেয়েও বেশি জ্বালাতন করছে।"

মৃত্যু

এ মহান ঐতিহাসিক ৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ১২৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ছিলেন মাগাজী চর্চার অগ্রদূত। তিনি আরব ইতিহাসচর্চাকে গৌরবান্বিত করেছেন। আরব ইতিহাসচর্চায় তার অবদানকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক

পরিচয়

ইবনে ইসহাক ছিলেন প্রখ্যাত সিরাহ বা মহানবী (স)-এর জীবন চরিত লেখক। তিনি ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৫ হিজরিতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর মতে, তাঁর কুনিয়া (ছদ্মনাম) ছিল আবুবকর, ইবনে সাদের মতে, আবু আবদুল্লাহ। তিনি ইমাম মালিক ও তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়েবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মুহম্মদ ইবনে আবুবকর, আবান-বিন-উসমান, আবু সালাম ইবনে আবদুর রহমান, ইমাম জয়নুল আবেদিনের পুত্র মুহম্মদ-আল-বাকির, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল-যহুরীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তার দাদা হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ হিজরিতে পারস্যের আইনুত তামারের যুদ্ধে সেনাপতি খালিদ-বিন-ওয়ালিদের হাতে বন্দি হন। পরে তিনি দাস রূপে কায়স-বিন-মাখরামা-বিন-আল-মুত্তালিব-বিন-আবদ-মানাফের কাছে হস্তান্তরিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ইবনে ইসহাক হাদিস চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি হাদিস বেত্তাদের সাহচার্য থেকে মহানবী (স)-এর সিরাহ বা জীবন চরিত, মাগাজী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইয়াজিদ-বিন-আবু হাবীবের অভিভাষণ শুনার জন্য মিশরে যান। মিশর থেকে ফিরে তিনি মহানবী (স)-এর জীবন চরিত লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম মালিক-বিন-আনাসের সাথে তার মত পার্থক্য দেখা দেয়। মালিক ইবনে আনাসের সাথে তার মত পার্থক্যের কারণে তিনি মদিনা ছেড়ে ইরাকে চলে যান। ইবনে হিশামকে জাল হাদিস দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইমাম যহুরি তার সম্পর্কে বলেন, "যতদিন ইবনে ইসহাক মদিনা থাকবে ততোদিন মদিনা জ্ঞান শূন্য হবে না।" এ মহান ব্যক্তি ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে ইসহাকের "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)"-এর বিষয়বস্তু

ইবনে ইসহাকের সীরাহ গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মোহাম্মদ (স)-এর পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য বংশক্রম ও মহানবী (স)-এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের মিশন শুরু পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর থেকে মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলি। তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরত থেকে শুরু করে মহানবী (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত। ইবনে ইসহাকের এ গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে শুরু করেছেন হযরত আদম (আ) থেকে মহানবী (স) পূর্ণাঙ্গ বংশক্রম দিয়ে। এর পর হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশ, আবরাহার মক্কা আক্রমণের কারণ, প্রস্তুতি মক্কা আক্রমণ। আবাবিল পাখি দ্বারা আল্লাহ্ কিভাবে

www.pathagar.com

আবরাহার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেয় তার নিখুঁত বিবরণ। তিনি তার গ্রন্থ রচনায় কোরআন, হাদিস, কুলজী সাহিত্য, তাওরাত, বাইবেল, কবিতা ইসরাইলী কাহিনী, প্রচলিত কিংবদন্তী ও উপাখ্যান উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আবার তিনি নও-মুসলিমদের কাছ থেকেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে ওয়াহাব-বিন-মুনাব্বিহ ও কাব-আল-আহবার-এর কাছ থেকে প্রাচীন জাতি ও নবীদের জীবনের ঘটনাবলি বিষয়ক ঘটনাবলি গ্রহণ করেছেন। তিনি মদিনার ইতিহাসচর্চা ঘরনার ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি তার সিরাহ রচনায় প্রচলিত কিংবদন্তীরও আশ্রয় নেয়। যেমন– তিনি মহানবী (স)-এর পিতা আবদুল্লাহর সম্পর্কে একটি কাহিনী বলেছেন। আর তা হলো ইবনে ফিহর বংশের এক রমনীর সাথে মহানবী (স)-এর পিতা আবদুল্লাহর দেখা হয়। রমনী তখন আবদুল্লাহর ললাটে (চোখে) ঔজ্জ্বল্য দেখতে পান এবং তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবদুল্লাহ উক্ত রমনীর প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বিবি আমেনাকে বিবাহ করেন। আবদুল্লাহ আমেনাকে বিয়ে করবার পর বিবি আমেনা যখন গর্ভবতী হন তখন সে উজ্জ্বল্য তার ললাটে দেখা যায়নি। রমনীর ভাই ছিল ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান ও ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। উক্ত রমনী তার ভাইয়ের কাছ থেকেই শুনেছিলেন এ বংশে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। ইবনে ইসহাক এ কাহিনী তার পিতা ইসহাক ইবনে ইয়াসার কাছ থেকে শুনেছেন।[২]

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। যেমন– আকাবার শপথে আসা সবার নামের তালিকা। বিভিন্ন যায়গায় হিজরত কারীদের নামের তালিকা। মহানবী (স)-এর যুদ্ধসমূহের বিবরণ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা ও শহিদদের এবং বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা। ওহুদের যুদ্ধে হিন্দার চরম নিষ্ঠুরতার কথা ইবনে ইসহাক বলেন "সালিহ ইবনে কায়সান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন– হিন্দা বিনতে উতবা এবং অন্যান্য রমনীরা রাসূল (স) সাহাবাদের মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করেছিল। তাদের কান ও নাক কেটে নিয়েছিলো হিন্দা তা দিয়ে পায়ের নুপুর ও গলাবন্ধনী বানিয়ে, দিল এবং নিজের নুপুর গলাবন্ধনী ও কানের দুল দান করেছিল জুবায়ের ইবনে মুতিসের ক্রীতদাস ওয়াহসিকে। হামযার কলিজা কেটে নিয়ে তা সে চিবিয়ে ছিল, কিন্তু তা গিলতে না পেরে ফেলে দিয়েছিলেন।"[৩] ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মদিনার সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর বিভিন্নদেশে দূত প্রেরণ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

---

২. "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" ইবনে ইসহাক (অনু শহীদ আখন্দ) ঢাকা-২০০২ পৃ-৮৯-৯০।
৩. "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" ইবনে ইসহাক (অনু শাহীদ আখন্দ) প্রাগুক্ত পৃ-৪৩১।

www.pathagar.com

"সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" গ্রন্থের উৎসমূহ

ইবনে ইসহাক তার "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স) গ্রন্থে যে সমস্ত উৎস ব্যবহার করেন তা হলো :

১. প্রাচীন গ্রন্থ ও আহলে কিতাবের বিবরন

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে ইসরাইলী কাহিনী, প্রাক-ইসলামী যুগের কুলজী সাহিত্য, কবিতা, আল-কোরআন, প্রচলিত কিংবদন্তী ও উপাখ্যান ব্যবহার করেছেন। তিনি সিরাহ আল-মুবতাদা অংশে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ তাওরাত, তালমুদ, জেনেসিস ও বাইবেল থেকে পূর্ব নবীদের ঘটনাবলি ও বংশক্রমে উপর তথ্য দিয়েছে। যেমন– প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও আরব উপাখ্যানে আদ ও সামুদ জাতির খোদা দ্রোহিতার পরিণতির কথা এসেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মক্কা আগমনের কথা আল-কোরআন থেকে নিয়েছেন। এ অংশে তিনি আহলে কিতাব ও নব্য মুসলমানদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্যে ওয়াহাব-বিন-মুনাব্বিহ ও কাব-আল-আহবার এ শ্রেণিভূক্ত। ইবনে ইসহাক তাদের কাছ থেকে প্রাচীন জাতি ও নবীদের জীবনী, ঘটনাবলির কথা সংগ্রহ করেন।

২. কুলজি ও কবিতা

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে আরবে কুলজী সাহিত্য, কবিতা আরবদের জীবনে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গোত্রের বীরত্বের কথা, তাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী জানা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তারা বংশের গৌরব অভিজাত্য নিয়ে গৌরববোধ করতো। ইসলামী যুগেও কুলজী চর্চা অব্যাহত থাকে। ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থেও কুলজী থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আবার তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে অনেক সমালোচনার শিক্ষার হন। তিনি অনেক ভূয়া কুলজী তার গ্রন্থে দেন।

৩. মদিনার ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রের ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ব্যক্তিদের কাছ থেকে মহানবী (স)-এর ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উরওয়া-বিন-যুবাইর, আবান-বিন-উসমান, মোহাম্মদ-বিন-শিহাব-আল-যহুরি, মুসা-বিন-উকবা, সাঈদ-বিন-মুসায়য়াব, সুহরাবীল-বিন-সাদ ও আসিম-বিন-উমর-বিন-কাতাদা।

www.pathagar.com

৪. মাগাজী অংশে কোরআন ও মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের তথ্য গ্রহণ

ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো মাগাজী। মাগাজীর অনেক তথ্য তিনি কোরআন থেকে নেন। যেমন– বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ, বিবি আয়শা (রা)-এর অপবাদ সংক্রান্ত ঘটনা, মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মদিনা আক্রমণের ঘটনা প্রভৃতি।

৫. কবিতার ব্যবহার

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে কবিতার যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। এ কবিতাগুলো ছিল সমকালীন। এ সব কবিতা তিনি ঘটনার সাথে মিল রেখে দিয়েছেন।

৬. কিংবদন্তী বা গল্প বা উপাখ্যান

ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থে কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়েছে। এসব কিংবদন্তী অনেক সময় অতিরঞ্জন করা হয়েছে। উদারহণ হিসেবে বলা যায় যে, মহানবী (স)-এর জন্মের আগে তার পিতা আবদুল্লাহর বিয়ে ও তার ললাটে উজ্জ্বল্য নিয়ে তিনি যে কাহিনী দিয়েছেন তা মোটেও সত্য নয়।

৭. প্রামাণ্য তথ্য অর্থাৎ লিখিত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

ইবনে ইসহাক প্রামাণ্য তথ্য অর্থাৎ লিখিত উৎস থেকে তার গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে "কিতাবাতে-আল-মদিনা" বা "মদিনার সনদ"-এর কথা বলা যায়। এছাড়াও আরো বলা যায় যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা ও উহুদের যুদ্ধে শহীদদের নামের তালিকা ইবনে ইসহাক দেন। এছাড়া হুদায়বিয়ার সন্ধির লিখিত ধারাগুলো এবং সন্ধির পরবর্তী বছরে বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে মহানবী (স)-এর পত্র পাঠানোর কথা বলেছেন।

ইবনে ইসহাকের লেখার সত্যনিষ্ঠ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। হিজরীর তৃতীয় শতকের হাদিস বেত্তারা ইবনে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেন না। আবার অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, যতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান বেঁচে থাকবে ততোদিন ইবনে ইসহাক বেঁচে থাকবেন, মালিক ইবনে আনাস ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাককে দাজ্জাল বা ভণ্ড (false messiah) বলেছেন মনে হয় ২টি কারনে মালিক ইবনে আনাস তার উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। আর তা হলো : (১) ইবনে ইসহাক মালিক ইবনে আনাসের হাদিস অবজ্ঞা করেছেন এবং সমালোচনা করেছেন, (২) ইবনে ইসহাক ইহুদী ও খ্রিস্টান উৎস বা আহল আল-কিতাব থেকে তথ্য নিয়েছেন।

www.pathagar.com

"সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" গ্রন্থের সমালোচনা

ইবনে ইসহাকের লেখা "সীরাতে রাসূলুল্লাহ্" মহানবী (স)-এর জীবনী নিয়ে লেখা সবচাইতে প্রাচীন গ্রন্থ। যদিও মূল কপিটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তার এ গ্রন্থের আমূল সংস্কার সাধন করেন। ইবনে ইসহাক বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে মহানবী (স)-এর জীবন চরিত রচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে বহু কিংবদন্তীর আশ্রয় নেন এবং বহু কবিতার আশ্রয় নেন। যা এ গ্রন্থের মান অনেক খানি কমিয়ে দেন। ইবনে ইসহাক বংশ তালিকারও কিছু কিছু ভুল তথ্য দেন। তিনি আবার "অনেকে বলেন," "অমুকের কাছ থেকে শুনা" "তারা বলেন," "এর সত্যতা একমাত্র আল্লাহই জানেন" এ শব্দগুলো ব্যবহার করে তিনি যে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে যে নিশ্চিত ছিলেন না তিনি তা প্রমাণ করেন। তিনি খুব সম্ভবত শিয়া ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলিফা আল-মনসুরের আদেশে এ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মহানবী (স)-এর জীবন চরিত রচনার একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তার এ পদ্ধতি পরবর্তীকালে সীরাহ সাহিত্যের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

আল-ওয়াকিন্দি

মুসলিম ইতিহাসচর্চায় একজন বিখ্যাত "মাগাজি" লেখক ছিলেন আল-ওয়াকিন্দি। তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে মুসলিম ইতিহাসচর্চায় মাগাজী রচনা করেন। তার রচনা শৈলী ছিল অসাধারণ। আব্বাসীয় দরবারে চাকরি করার সুবাদে তিনি সরকারি দলিল, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, ফরমান ব্যবহার করবার সুযোগ লাভ করেন। তাই তার মাগাজী সাহিত্য হয়ে ওঠে জীবন্ত ইতিহাস।

প্রাথমিক জীবন

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুসলিম মাগাজি ঐতিহাসিকদের মধ্যে আল-ওয়াকিন্দি ছিলেন অন্যতম। তিনি ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৩০ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম ছিল মুহম্মদ-বিন-উমর-আল-ওয়াকিন্দী। সে যুগে তিনি বিখ্যাত দুজন মালিক-বিন-আনাস ও সুফিয়ান-আল-খাওরির ছাত্র ছিলেন। ঐতিহাসিক তাবারির মত তিনি হাদিস, আইন শাস্ত্র ও ইতিহাস বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি শস্য ব্যবসায়ি ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুনের সময়ে (৮১৩ – ৮৩৩ খ্রি.) তিনি বাগদাদে কাজির পদলাভ করেন। তিনি একজন দানশীল ছিলেন। তিনি বই পড়তে খুবই ভালবাসতেন। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ১২০ উষ্ট্র বোঝাই গ্রন্থ মজুত ছিল। শুধু তাই নয় মৃত্যুর সময় তিনি ৬০০ বাক্স বই রেখে যান।

www.pathagar.com

আল-ওয়াকিন্দি ২৮টি বই লিখেন। তিনি "আবু বকরের সিংহাসন আরোহণ," "মহানবী (স)-এর মৃত্যু রিদ্ধা," "ওসমান হত্যা," "সিফফিন" "আল জামাল" প্রভৃতি বিষয়ে ইতিহাস লিখেন। তবে তার বিখ্যাত ৪টি গ্রন্থের নাম হলো :

(১) কিতাব-আল-সিরাহ, (২) কিতাব-আল-তারিখ-আল-মাগাজি, (৩) তারিখ-ই-কবির ও (৪) কিতাব-আল-তাবাকাত। এগুলোর মধ্যে থেকে তার মাগাজির অংশ বিশেষ বর্তমানে বিদ্যমান আছে। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত-এর জার্মান অনুবাদ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে বলে ঐতিহাসিক ডি. এস. মারগলিয়েথ বলেন।

আল-ওয়াকিন্দির মাগজি রচনার বিষয়বস্তু

আল-ওয়াকিন্দী "কিতাব-আল-মাগাজি" রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি তার গ্রন্থে মহানবী (স)-এর সামরিক অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মদিনায় হিজরতের পর থেকে বদর যুদ্ধের আগে ছোট ছোট সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে সকল যুদ্ধের বিবরণ তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার "মাগাজি" গ্রন্থের উৎসসমূহের একটি তালিকা দিয়েছেন। মহানবী (স) যে সব যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন সে সব ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিতে মদিনার প্রশাসকদের নামের তালিকা দিয়েছেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধের তারিখ উল্লেখ করেছেন। আল-ওয়াকিন্দি সামগ্রিক সনদ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এর পর তিনি পরস্পর বিরোধী বিবরণ করেছেন। তার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তার অন্যান্য গ্রন্থে ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তার "আল-তারিখ-আল-কবীর" নামক গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার ইতিহাস থেকে শুরু করে আব্বাসীয় আমলের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়কালের ৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। আল-ওয়াকিন্দি হাদিসভিত্তিক মাগজি চর্চার সাথে আখবার ভিত্তিক ইতিহাসচর্চার সেতুবন্ধন রচনা করেছেন।

মৃত্যু

এ মহান ঐতিহাসিক ৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সমালোচনা

আল-ওয়াকিন্দির সমালোচনা করে ইমাম শাফেয়ী বলেন, "ওয়াকিন্দি নির্ভরযোগ্য নন, কারণ তিনি ইহুদীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।" ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, "তার লেখনীসমূহ সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত ইতিহাস রচনার ধারণা

www.pathagar.com

দেয়, যার মধ্যে রয়েছে জীবন্ত পদ্ধতিতে পরিবেশিত আকর্ষণীয় রসবোধ।" অধ্যাপক দুরি বলেন, "ইবনে ইসহাক অপেক্ষা ওয়াকিন্দি ইসনাদের ব্যাপারে অধিক যত্নবান ছিলেন।" দুরি আরো বলেন যে, ওয়াকিন্দি মহানবী (স)-এর যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলোর ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। এছাড়াও আল ওয়াকিন্দি সঠিক তথ্য নির্ণয়, নতুন সূত্র সম্পর্কে বঙ্গানুবাদ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুশরিকদের পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রগুলো ও ঘটনাবলির যায়গা পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এছাড়াও তিনি তার লেখার প্রয়োজনে পবিত্র কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত উপস্থাপন করেছেন। যেমন– বদর (৬২৪ খ্রি.), ওহুদ যুদ্ধ (৬২৫ খ্রি.), খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রি.) প্রভৃতি যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক মার্গোলিয়েথ বলেন, "আল ওয়াকিন্দির লেখা সম্পর্কে মুসলিম গবেষকদের ঐকমত্য বিবেচনা না থাকলেও অধিকাংশ পণ্ডিতদের কাছেই তার লেখনী অনুকূল বিবেচনা পেয়েছে।" সর্বপরি আল-ওয়াকিন্দি আব্বাসীয় প্রশাসনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তিনি সরকারি দলিল পত্র ও আরকাইভস ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন। তিনি মহানবী (স)-এর মাগাজি রচনায় একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, ঐতিহাসিক বালাযুরী তার গ্রন্থে ৮৭ বার আল-ওয়াকিন্দির নাম উল্লেখ করেন।

ইবনে সাদ

প্রাথমিক জীবন

ইবনে সাদ হাশেমী বংশে ইরাকের বসরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মাগাজি লেখক আল-ওয়াকিন্দির সচিব এবং আরেক বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক বালাযুরী ছিল তার ছাত্র।

জীবনী লেখক হিসেবে ইবনে সাদ

হাদিস ও আখবারের সমন্বয়ে ইতিহাসচর্চার পরিধি বিস্তৃত করতে তিনি "আল-তবাকাত-আল-কুবরা" বা বৃহত্তর ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংকলন করেন। এ গ্রন্থের প্রথম তবাকাতে দেখা যায় মহানবী (স)-এর জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সিরাহ বর্ণনার পদ্ধতিতে মহানবী (স)-এর জীবনের শেষ অধ্যায়ের কার্যকলাপ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আল-ওয়াকিন্দির অপেক্ষা আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রের ব্যবহার করেন। তিনি তার গ্রন্থে মহানবী (স)-এর নবুয়ত

www.pathagar.com

প্রাপ্তি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ৮ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর তবাকাত মহানবী (স) ও তার সাহাবীদের জীবন বৃত্তান্ত হিসেবে ইবনে হাজার, ইবনে খাল্লিকান, ইমাম মালিক প্রমুখ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বালাযুরী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "ফুতুহু বুলদানে" ৪৮ বার ইবনে সাদের কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী (স) ও তার সাহাবীদের নিয়ে ইবনে সাদের লেখা "তাহাযীর-আল-তাহযীব" তাকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছে। তিনি মহানবী (স) ও সাহাবীদের নিয়ে লিখেছেন। তার গ্রন্থে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু, তিনি মহানবী (স) সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য দিতে পারেন নি। তিনি আওস ও খাজরাজের কাছে মহানবী (স)-এর আমন্ত্রণ ও আকাবার শপথের কথা লিখেছেন। তিনি আরব ইতিহাসচর্চাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। W. M. Watt বলেন, "His biographies of Muhammad's companions are a mine of useful information about the background of Muhammad's Life."

মৃত্যু

এ মহান ঐতিহাসিক ৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ২৩০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে হিশাম

প্রাথমিক জীবন

বিশ্ববিখ্যাত সিরাহ লেখক ছিলেন ইবনে হিশাম। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তার পুরো নাম হলো আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী।[৪] তার পিতার নাম হিশাম দাদার নাম আইউব। হিমাইয়ারী বংশের মুআফিরী শাখায় তার জন্ম। মতান্তরে তিনি আদনান বংশের সন্তান। ইবনে হিশামের জন্ম ইরাকের বসরাতে। তার বংশের সবাই মিশরে বাস করত। তাই তিনি ছোট বেলাতেই সেখানে চলে যান। তিনি মিশরের ইমাম সাফেইর সান্নিধ্য লাভ করেন। ইবনে হিশাম ছিলেন একাধারে হাদিসবেত্তা, বংশ-লতিকা বিশারদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আরবি ব্যাকরণবিদ, ভাষা বিজ্ঞানী। "সীরাতুন নবী (স)" ছাড়াও তিনি হিমাইয়া গোত্রের ইতিহাস "তারিখ সালাতীন হিমাইয়ার" এবং দক্ষিণ আরবীয় পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে "কিতাবুত-তীজান" রচনা করে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

---

৪. "সীরাতুন নবী (স)" (১-৪ খণ্ড) ইবনে হিশাম (অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদনা পরিষদ) ঢাকা-২০০৮।

www.pathagar.com

"সীরাতুন নবী (স)"-এর বিষয়বস্তু

"সীরাতুন নবী (স)" ইবনে হিশামের কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। এটি ছিল ইবনে ইসহাকের লেখা "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)"-এর গ্রন্থটির সংশোধন করে নিজের মতামত দিয়ে লেখা। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে অনেক আধুনিক ছিলেন। তিনি ইবনে ইসহাকের অনেক তথ্য যাচাই-বাছাই করে তা গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক অপেক্ষা আরো নতুন তথ্য দিয়েছেন। যেমন– হুদায়বিয়ার সন্ধি, মদিনার সনদ ইবনে ইসহাক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। ইবনে হিশাম এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ইবনে হিশাম মদিনার সনদের ধারাগুলো তুলে ধরেন। এ ধারা ছিল ৫৩টি।[৫]

নিম্নে ইবনে হিশাম প্রদত্ত "মদিনার সনদের" ধারাগুলো দেয়া হলো :

ইয়াহূদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুক্তি[৬]

১. অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মত বলে গণ্য হবে।

২. কুরায়শের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৩. এবং বনূ আওফের লোকেরা (আনসারগণ) পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের মুক্তিপণ বন্দীপণ পরিশোধ করে মুক্ত করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৪. আর বনূ সাঈদা তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৫. বনূ হারিস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

---

৫. "সিরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" ইবনে হিশাম (অনু. সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা-২০০৭; পৃ: ১৭৫-১৮১।

৬. "সীরাতুন নবী (স)" ইব্ন হিশাম ২য় খণ্ড ঢাকা-২০০৮, পৃ-১৭৫-১৮১।

www.pathagar.com

৬. বনূ জুশাম তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৭. বনূ নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৮. বনূ আমর ইবন আওফ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্য হয়।

৯. বনূ নাবীত তাদের প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১০. বনূ আওস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণসমূহ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১১. আর বিশ্বাসীদেরকে নিঃস্ব অভাবগ্রস্তরূপে ছেড়ে দেয়া হবে না। যাতে করে তারা ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে।

১২. কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে না।

১৩. আল্লাহভীরু মু'মিনরা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় করবে বা গুরুতর অবিচার, পাপ, সীমালঙ্ঘন বা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে, তাদের সকলের সমবেত হস্ত তার বিরুদ্ধে উত্থিত হবে– যদিও সে তাদের কারো আপন পুত্রও হয়।

১৪. কোন মু'মিন ব্যক্তি কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোন মু'মিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিম্মা বা অভয় অভিন্ন। তাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি কাউকে অভয় দিয়ে সকলকে সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে। আর মু'মিনগণ অন্যান্য লোকের মুকাবিলায় পরস্পর ভাই ভাই।

www.pathagar.com

১৬. আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা আমাদের আনুগত্য করবে, তারাও সাহায্য ও সমতার হকদার বলে গণ্য হবে, তাদের প্রতি যুলুমও হবে না আর তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করাও চলবে না।

১৭. আর মুলমানদের সন্ধিও অভিন্ন সন্ধি। আল্লাহর রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শত্রুর সাথে সন্ধি করবে না– যাবৎ না এ সন্ধি সকলের জন্যে সমান ও ন্যায়ানুগ হবে।

১৮. এবং আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের একে অপরের পিছনে থাকবে।

১৯. আর ঈমানদারগণ আল্লাহর রাহে মৃত তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে।

২০. আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিন মুত্তাকীগণ সব চাইতে সহজ-সরল ও সঠিক পথে রয়েছে।

২১. আর কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি কোন কুরায়শের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

২২. আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়ে যাবে, তার উপর থেকে কিয়াস গ্রহণ করা হবে– হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়, আর সমস্ত মু'মিনের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এছাড়া তার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই (অর্থাৎ এটা অবশ্য করণীয়।)

২৩. আর যে মু'মিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে কোন ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।

২৫. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।

www.pathagar.com

২৬. বনূ আওফের ইয়াহূদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতরূপে গণ্য হবে। ইয়াহূদীদের জন্যে তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি যুলুম বা অপরাধ করবে, সে তার নিজকে ও নিজ গৃহবাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

২৭. এবং বনূ নাজ্জারের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার পাবে।

২৮. বনূ হারিসের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার লাভ করবে।

২৯. বনূ সা'ঈদার ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের সমান অধিকার পাবে।

৩০. বনূ জুশামের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩১. এবং বনূ আওসের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩২. বনূ সা'লাবার ইয়াহূদীদের জন্যে বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে। তবে যে যুলুম বা অপরাধ করবে– সে তার নিজকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস করবে।

৩৩. আর নিঃসন্দেহে জাফনা গোত্রও সা'লাবার শাখা-গোত্র, সুতরাং তারাও তাদের অর্থাৎ সা'লাবাদের মত অধিকার ভোগ করবে।

৩৪. আর বনূ শুতায়বার লোকজনের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে– বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয়।

৩৫. আর সা'লাবাদের মাওয়ালীরাও তাদেরই মত অধিকার লাভ করবে।

৩৬. এবং ইয়াহূদী শাখা-গোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।

৩৭. তাদের মধ্যকার কেউই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেখে যুদ্ধার্থে বহির্গত হবে না।

৩৮. এবং যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি রক্তপাত কবে, সে নিজে ও নিজ পরিজনদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অবশ্য, যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং (সে হিসাবে) আল্লাহ্‌র আনুকূল্য পাবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

www.pathagar.com

৩৯. ইয়াহূদীদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে এবং মুসলিমগণের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে।

৪০. যে কেউ এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক থাকবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

৪১. আর কোন পক্ষ তার মিত্র পক্ষের অপকর্মের জন্যে দায়ী হবে না আর অত্যাচারিতই সাহায্যের হকদার বলে গণ্য হবে।

৪২. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সাথী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৩. আর ইয়াসবির উপত্যকা এই চুক্তিনামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হবে।

৪৪. আর কোন পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে– সে কোন ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।

৪৫. আর কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়– যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ তা'য়ালা এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপিত করতে হবে। এ চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয়।

৪৭. কোন কুরায়শকে বা তাদের সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

৪৮. আর চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসবির আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।

৪৯. যখন তাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ যখন তারা সন্ধির জন্যে আহ্বান জানাবে তখন মু'মিনদেরকেও সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তবে, যদি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবে না।

৫০. প্রত্যেককে তার নিজের দিকেও প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৫১. আর আওসের ইয়াহূদীরা– তারা নিজেরা হোক বা তাদের মাওয়ালী হোক, এই চুক্তিতে শরীক পক্ষসমূহের সমান অধিকার লাভ করবে– এই চুক্তির পক্ষসমূহের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

৫২. আর এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বের হবে এবং যে ব্যক্তি মদীনায় বসা থাকবে, উভয়েই নিরাপত্তার হকদার বিবেচিত হবে; অত্যাচারী এবং অপরাধী এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

৫৩. আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) ঐ ব্যক্তির সপক্ষে রয়েছেন, যে চুক্তিপালনে নিষ্ঠাবান ও আল্লাহকে ভয় করে।

অধ্যাপক দুরি বলেন যে, হিশাম ইবনে ইসহাকের গ্রন্থটির মিথ্যা বিবরণগুলি সংশোধন করেছেন এবং জাল কবিতাগুলোকে বর্জন করেছেন। ইবনে হিশাম আরো একটি কাজ করেছেন যা ইবনে ইসহাক করেননি। মহানবী (স) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন মদিনা নগরীকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাকে রেখে যেতেন তা উল্লেখ করেননি। ইবনে হিশাম সেসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের অনেক ভুল বংশ তালিকা সংশোধন করেছেন। ইবনে হিশাম তার 'সীরাতুন নবী (স)" নামক গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি ইবনে ইসহাকের দেয়া বাইবেলের অনেক তথ্য বাদ দেন। ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের সংশোধন করে ইবনে হিশাম মহানবী (স)-এর জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেন। ঐতিহাসিক জালালুদ্দিন সুয়ুতি ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

মৃত্যু

এ মহান ঐতিহাসিকের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ইতিহাসে বিতর্ক আছে। তিনি মিশরের ফুসতাতে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে ১৩ই রবীউস সানী ২১৮ হিজরিতে, মতান্তরে ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে হিশাম ছিলেন একজন বিখ্যাত সিরাহ লেখক। তিনি ইবনে ইসহাকের বিখ্যাত "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" গ্রন্থে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা সংশোধন করে নতুন তথ্য সংযোজন করে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সীরাতুন নবী (স)" রচনা করেন। এটি মহানবী (স)-এর সিরাহের উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত। এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ করা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
খবর ও কুলজি বা বংশক্রম

খবর

"খবর" আরবি শব্দ। "খবর' একবচন এবং এর বহু বচন হলো "আখবার"। খবরের আভিধানিক অর্থ হলো সংবাদ পরিবেশন, বিবরণ প্রদান। আরবদের পরিভাষায় খবর হলো গল্প বলার রীতি অথবা প্রাচীন বা সমসাময়িক ঘটনাবলিকে খুব সুন্দরভাবে বা ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা। যে কোন ঘটনাকে চমৎকার করে উপস্থাপন করার কৃতিত্ব হলো বিবরণ প্রদানকারীর। প্রাক ইসলামী আরবে আমরা দেখি "রুওয়াত" বা "বর্ণনাকারীরা" ও কবিরা সন্ধ্যার মজলিসে কিংবা কোন গল্পের আসরে গোত্রের বীরত্ব ও সৌর্যবীর্যের কাহিনী বলতেন। এসব কাহিনীর মধ্যে প্রাক-ইসলামী আরবের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। ইসলামী যুগেও এ আখবারি ঐতিহাসিকরা সে ধারা বজায় রাখে। মহানবী (স)-এর সিরাহ ও মাগাজি লেখকদের পর এসব আখবারি ঐতিহাসিকরা একটি বিজ্ঞান সম্মত ঐতিহাসিক পদ্ধতি দাঁড় করাতে সক্ষম হন। যারা 'খবর" প্রদান করতেন তাদেরকে বলা হত "আখবারি।" খবর সংকলন করা শুরু হয়েছিল উমাইয়া খিলাফত কালে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মজলিস বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে "রুওয়াত" (কবিতা আবৃত্তিকারী) তাদের পরিবার বা গোত্রের পূর্বের ইতিহাস বর্ণনা করতেন এবং তা ছিল হিজরির দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে। তারা যে শুধু মৌলিক বর্ণনার আশ্রয় নিতেন তা নয়। এগুলোকে তারা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতেন। এ খবর বা আখবারি ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল কুফা ও বসরা। এসব খবর বা আখবারি ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন–

১. আবু মিখনাফ (মৃ. ৭৭৪ খ্রি. – ১৫৭ হিঃ)

তিনি কুলজি বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কুফার আখবারিক। তিনি ৩০ টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের পূর্ণাঙ্গ লেখা লিখেন। এসব ঘটনার তথ্য সংগ্রহে তিনি আযদ গোত্রের বিবরণের উপর অধিক নির্ভর করেন। এছাড়াও তিনি তামীম, হামদান, তাই ও কিনদার বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েত যুক্ত করেছেন। এসব তথ্যের সাথে তিনি মদিনার রেওয়ায়েতের সংযোগ ঘটান। তিনি শিয়া ছিলেন এবং তিনি উমাইয়াদের প্রতি কঠোর ছিলেন।

www.pathagar.com

২. আওয়ানা-বিন-হাকাম (মৃ. ৭৬৪ খ্রি. – ১৪৮ হিঃ)

তিনিও কুফার আখবারিক ছিলেন। তিনি "কিতাব-আল-তারীখ" ও "সিরাহ-আল-মুয়াবিয়া ওয়া বনী উমাইয়া" নামে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেন। তার প্রথম গ্রন্থে তিনি হিজরির প্রথম শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় গ্রন্থে উমাইয়াদের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

৩. সাঈফ-বিন-উমর (মৃ. ৭৯৬ খ্রি. – ১৮০ হিঃ)

তিনিও কুফার আখবারি ছিলেন। তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটিতে তিনি "রিদ্ধা" বা "ধর্ম ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এবং দ্বিতীয়টিতে তিনি "ফিতনা" বা "রাষ্ট্রের যুদ্ধ" সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তামীম গোত্রের রেওয়াতের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মদিনার বিখ্যাত ঐতিহাসিক উরওয়া-বিন-যুবাইর ও মুহাম্মদ বিন ইসহাকের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

৪. নসর-বিন-মজাহিম (৮২৫ খ্রি. মৃত্যু – হিঃ ২১২)

তিনিও কুফার আখবারি ছিলেন। তিনি শিয়া ছিলেন। তার লেখায় আমরা শিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখতে পাই। এগুলোর মধ্যে "আল-জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ)," "সিফফিন," "মাকতাল-আল হোসাইন" 'বা "হোসাইনের হত্যা," "হাজার-বিন-আদির হত্যা," "আখবার-আল-মুখতার" বা "মুখতারের সংবাদ," "শিয়া ইমামের চারিত্রিক গুণাবলি" ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি মুয়াবিয়া ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে হাদিস পরিবেশন করেন। তিনি রেওয়াতে বা বর্ণনায় অধিক সংখ্যক কবিতা, বাগধারা ও ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উগ্রপন্থি শিয়া ছিলেন এবং উমাইয়াদের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন বলে তার লেখা সমালোচিত হয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারি ও ইবনে আল-হাদীদ তার গ্রন্থ থেকে সূত্র উল্লেখ করেছেন।

৫. আল-মাদায়েনি (৭৫৮-৮৩৯ খ্রি. – ১৩৫ – ২২৫ হিঃ)

আল-মাদায়েনি ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আখবারি ঐতিহাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাগদাদে বাস করেন এবং এখান থেকেই তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা পান। তিনি ২৪০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। মহানবী (স)-এর জীবন থেকে শুরু করে আব্বাসীয় শাসনামল পর্যন্ত তার আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি বিখ্যাত জ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ ইসহাক-বিন, ইব্রাহিম আল-মাসুলির আনুকূল্য লাভ করেন। তিনি তার লেখায় পুরো আরবের রাজনীতি, সাহিত্যিক ও সামাজিক দিক আলোচনা করেছেন। প্রাক ইসলামী যুগ থেকে শুরু করে হিজরী তৃতীয় শতক শুরু পর্যন্ত তার লেখার বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

তার লেখার মূল বিষয়বস্তু ছিল মহানবী (স) সংক্রান্ত। তার লেখায় আলোচিত হয়েছে মহানবী (স)-এর পূর্ব পুরুষদের পরিচয়, ভণ্ড নবীদের বিবরণ, মহানবী (স)-এর সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ওহী নাজিল হয়েছে। এছাড়াও তার লেখার স্থান পেয়েছে কুরাইশদের কুলজি সংক্রান্ত, অভিজাত শ্রেণির বিবাহ বিষয়ক, খলিফাদের নাম ইত্যাদি। এছাড়াও মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত লেখাও ছিল। মুসলমানদের সিরিয়া, ইরাক খোরাসান, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের বিজয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। অথচ তিনি মুসলমানদের উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় সম্পর্কে নিরব ছিলেন। তিনি আরবদের অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র আলোচনা করেছেন। যেমন– অশ্ব-অশ্ব দৌড়, কাচা ঘর, আরব জীবন প্রণালী ইত্যাদি। তিনি ঘটনার সত্যতা নির্ণয়ে অত্যন্ত সতকর্তা অবলম্বন করতেন। এ জন্য তিনি অন্যান্য আখবারিদের চেয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ঐতিহাসিক মার্গোলিয়থ বলেন, "যদি এটা বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকদের উৎস-ইতিহাসের মূল হিসেবে বিবেচিত, তা হলে বলতে হবে যে, তিনি একক বর্ণনা পদ্ধতি হতে ধারাবাহিক বা চলমান বর্ণনার পরিবর্তনকারী ধারার প্রবর্তন করেন।" নিঃসন্দেহে তাকে একজন স্বার্থক ইতিহাসের রূপকার বলা যায়।

কুলজি

"কুলজির" আরবি শব্দ হলো "নসব"-এর অর্থ হলো "বংশ পরিচয়।" এ কুলজি বা বংশ পরিচয় আরব ইতিহাসচর্চার অন্যতম উৎস। হিজরির প্রথম শতকেই এর বিকাশ লাভ করে। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের লোকেরা তাদের বংশ ও গোত্রের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা করা তাদের ঐতিহ্য ছিল। কবিতা পাঠের আসরে বা সন্ধ্যার আড্ডার মজলিশে কবিরা নিজ নিজ গোত্রের বীরত্ব ও গুণকীর্তন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হতেন। এর ফলে গোত্রগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্বপুরুষদের উল্লেখ, তাদের বীরত্ব সম্পর্কে, তাদের মহানুভবতা সম্পর্কে বিবরণ থাকতো। এসব কুলজি চর্চা আরবদের জীবনের সাথে একেবারে মিশে গিয়েছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে আমরা দেখি এসব কুলজি চর্চায় বংশ গৌরব যে থাকতো তা নয়, তাদের পশু, ঘোড়ার বর্ণনাও থাকতো। আসলে নিজ বংশ বা গোত্রের গুণকীর্তন এবং অন্য বংশ বা গোত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা এসব কুলজিবিদদের উদ্দেশ্য ছিল। আবার যুদ্ধে সাফল্য ও বীরত্ব সম্পর্কেও আমরা কুলজি চর্চা দেখি। ইসলামী যুগে এ কুলজি চর্চা বহুমাত্রিকতা পায়। এ কুলজি চর্চার গুরুত্ব বহু গুণে বেড়ে যায়। খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া শাসনামলে কুলজি চর্চার বিকাশ লাভ করে। মহানবী (স)-এর সময়ে যেসব যোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের জীবনী ও বংশ কুলজি চর্চার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কারণ বদর

www.pathagar.com

যুদ্ধসহ যেসব যুদ্ধে সাহাবীরা অংশগ্রহণ করে এবং অন্যান্য যুদ্ধে যেসব সাহাবী অংশ গ্রহণ করে তাদের নামের তালিকা ও বংশগত অবস্থান সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে সরকারি ভাতা পাবার জন্য এ কুলজির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.) কুলজির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ রেজিস্ট্রি করার জন্য নির্দেশ দেন। কয়েকজন কুলজি বেত্তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. মুহম্মদ-বিন-সায়িব-আল-কালবি (মৃ. ৭৬৩ খ্রি.-১৪৬ হিঃ)

তিনি কুলজি, পরিভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কীয় বিষয়াবলি শিক্ষাদান করতেন। প্রত্যেকটি গোত্রের শ্রেষ্ঠ কুলজি বিশারদদের কাছ থেকে তিনি রেওয়ায়েত এবং নাকাইয (কবিতা) সংগ্রহ করতেন। উমাইয়া যুগের কবি ফারাযদাকের কবিতা থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে 'কুলজি পাঠ রীতি" প্রবর্তন করেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি হাদিস বেত্তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমালোচিত হন।

২. হিশাম-বিন-মুহম্মদ-আল-কালবি (মৃ. ৮১৯ খ্রি.-২০৪ হিঃ)

তিনি ছিলেন মুহম্মদ-বিন-সায়িব-আল-কালবির পুত্র। তিনি পিতার মত একজন বিখ্যাত কুলজি বিশারদ ছিলেন। তবে তিনি পিতার থেকে আরো অগ্রসর ছিলেন। তিনি ১৫০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "জামহারা-আল-নসব" ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

৩. আবু ওবায়দা আমার-বিন-আল-মুসান্না (৭২৮-৮২৫ খ্রি.)

আবু উবাইদাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট কুলজি বিশারদ। তিনি ছিলেন একজন উগ্রপন্থী শুয়বিয়াহ আন্দোলনের সমর্থক। আরব ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আরবদের যুগ "আইয়াম-আল-আরবের" ও "খবর" সম্পর্কে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে "নগর ও শহর", "গোত্রীয় মর্যাদা ও দোষ-ত্রুটি" যুদ্ধসমূহ, সম্প্রদায় (যেমন– খারিজি সম্প্রদায়), আইনজ্ঞ বিচারকগণ, মাওয়ালী প্রভৃতি। তার গ্রন্থ কিতাব-আল-মাওয়ালি, আখবার আল ফারস।

৪. মুসাব-আল-যুবাইর (৮৪৭-৫০ খ্রি.-২৩৩-৩৬হি মৃ.)

তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বংশধর। তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। আর তা হলো "আল কবির" ও "নসবু কুরাইশ"। তিনি কুলজী সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় ইতিহাস-আল বালাযুরীর "ফুতুহ বুলদান" এবং "আনসাব-আল আশরাফ"

আল-বালাযুরী

প্রাথমিক জীবন

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বালাযুরী হিজরীর দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে অথবা তৃতীয় শতকের শুরুর দিকে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালাযুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাকে বালাযুরী বলা হয়ে থাকে। "বালাযুর" হলো এক প্রকার মাদক জাতীয় ঔষধ। শেষ বয়সে তিনি উক্ত মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এর ফলেই তার মৃত্যু হয়। আবার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডি. এস. মারগোলিয়থ বলেন যে, এ মাদক দ্রব্য তার দাদা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। আসলে এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। তার পিতার নাম ছিল ইয়াহিয়া। তার পিতামহ জাবির ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমলে মিশরের রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ "আল-খাসীব"-এর কাতিব বা সচিব। আল-বালাযুরীর পুরো নাম ছিল আবুল হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া জাবির আল-বাগদাদী বালাযুরী। লাউডেনের পাঠাগারে রক্ষিত এবং মাকরিজীর লেখা বলে অনুমান একটি লিপিতে বালাযুরীকে আবু বকর, আবু জাফর, আবুল হাসান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা জীবন

তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নিজে ছিলেন একজন কুলজিবিদ, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, কাব্য-কবিতা এবং আরব ও পারস্যের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দামেস্ক, এন্টিয়ক ও এমেসাসহ সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন শহরে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন নবম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) তিনি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফা আল-মুনতানসিরের সময়েও দরবারে তার প্রভাব ছিল। কিন্তু, পরবর্তী খলিফা আল-মুতামিদের (৮৭০-৮৯২ খ্রি.) সময়ে তার ভাগ্যের পতনের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

বালাযুরীর ইতিহাসচর্চা

(ক) ফুতুহুল বুলদান

আল-বালাযুরী "আল-ফুতুহাত" শিরোনামের অধীনে দুটি বিজয় ইতিহাস গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। একটি "নগর ও শহর বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" আর অন্যটি হলো ৪০ খণ্ডে "শহর ও নগর বিজয়ের বিস্তারিত ইতিহাস।" শেষের গ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি সময়ের অভাবে। তাই তিনি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে "ফুতুহুল বুলদান" নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি লেখেন। বালাযুরী তার "ফুতুহুল বুলদান" গ্রন্থটি শুরু করেছেন মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরত দিয়ে।[১] এরপর বনী নযীরদের ধন সম্পদ, বনী কারায়যার ধন সম্পদ, খায়বার বিজয়, মক্কা বিজয়, মক্কার কূপসমূহ খননের বর্ণনা, মক্কার প্লাবনসমূহের বিবরণ, আরবদের মুরতাদ হওয়ার বিবরণ, সিরিয়া বিজয়, বসরা বিজয়, জালুলার যুদ্ধ, সিন্ধু বিজয়, কাদিসিয়ার যুদ্ধ, বিজিত অঞ্চলের শাসন সুদৃঢ় করণ, প্রশাসনিক কাঠামোর বিবরণ, কর নির্ধারণ, মুদ্রা প্রচলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিলালিপি, অফিস-আদালতে রোমান ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষার প্রবর্তন, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।[২] সিন্ধু বিজয় ও মুহম্মদ বিন-কাশিমের মৃত্যু সম্পর্কে আল-বালাযুরী আমাদেরকে এক নতুন তথ্য দেন। সিন্ধু অভিযানের আগের ও পরের প্রত্যেকটি বর্ণনা বালাযুরী খুবই নিখুঁতভাবে দেন। সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ যে ছিল সিন্ধুর জলদস্যুদের দ্বারা আরব জাহাজ লুণ্ঠন ও রাজা দাহিরের দস্যুদের শাস্তি প্রদানের অবহেলা তা বালাযুরী বর্ণনা করেন।[৩] মুহম্মদ-বিন-কাশিমের বন্দি ও মৃত্যু সম্পর্কে বালাযুরী সম্পূর্ণ নতুন তথ্য দেন। আর তা হলো : খলিফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুর– পর সোলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করে ইয়াজীদ-ইব্ন-আবু-কাবশা সাকসাকীকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদ মুহম্মদ বিন-কাশিমকে বন্দি করেন। মুহম্মদ-বিন-কাশিমের বিদায়ে সিন্ধুবাসীরা কি রকম মর্মাহত হয় তার বর্ণনায় বালাযুরী বলেন, "তার বিদায়ে সিন্ধুবাসীরা যারপরনাই মর্মাহত হলো। তারা কেঁদে বুক ভাসাল, তারা কীরাজে তার একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রাখল।"[৪] ইরাকে বন্দি করে মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে পাঠানোর পর ইরাকের গভর্নর সালিহ মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে ওয়াসিতে কারারুদ্ধ করে রাখে। বালাযুরী বলেন, "সালিহ তাকে" আকীল খান্দানের কতিপয় লোকসহ একত্রে নির্যাতন করতে করতে হত্যা করে। এভাবে সে তার ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেয়। হাজ্জাজ তার ভাই আদমকে হত্যা করেছিলেন। কারণ, সে ছিল একজন পাক্কা খারিজী।"[৫] বালাযুরী তার 'ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে মুসলমানদের স্পেন বিজয়, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করেননি। বালাযুরী তার "ফুতুহু

---

১. *"ফুতুহুল-বুলদান" আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহইয়া বালাযুলী (র.)" সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-১৯৯৮।*
২. *"ফুতুহুল বুলদান" আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.)" ঢাকা-১৯৯৮।*
৩. *"ফুতুহুল বুলদান" পৃ-৪৪৩-৪৫৯।*
৪. *"ফুতুহুল বুলদান" পৃ-৪৫৩।*
৫. *ঐ পৃ-৪৫৪।*

www.pathagar.com

বুলদান" গ্রন্থ রচনা করবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। ঐ অঞ্চল সম্পর্কে জেনেছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করে তা তার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে কারণে তাকে শুধু একজন ঐতিহাসিকই শুধু নয় সে সাথে একজন স্বার্থক ভূগোলবিদও বলা যায়। ইয়াকুত (১১৭৯-১২২৯ খ্রি.) আল-মাকদিসি (মৃ. ১২৪৫খ্রি.) আল-মাসুদী (মৃ. ৯৫৭ খ্রি.) প্রমুখ বালাযুরীর তথ্য অকাতরে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "আল-বালাযুরীই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন শহর ও দেশ জয়ের কাহিনীগুলিকে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই ইতিহাস রচনার বিশেষ ধরন হিসেবে প্রবন্ধ লেখার যে রীতি গড়ে ওঠেছিল, তার অবসান ঘটল।"[৬]

খ. আনসাব-আল-আশরাফ

বালাযুরীর লেখা "আনসাব-আল-আশরাফ" গ্রন্থটিও অত্যন্ত মূল্যবান।

এ গ্রন্থে তিনি মহানবী (স) ও তার আত্মীয় স্বজনদের জীবনী দিয়েই শুরু করেছেন। তারপর খোলাফায়ে রাশেদীন, আলী বংশীয়, ও উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষায়, "এ গ্রন্থের শেষ উল্লেখযোগ্য জীবনী হলো হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের "কিতাবুল আনসাব।" এটা কুলজি গ্রন্থ হলেও আসলে এটা ছিল ইবনে সাদের তবাকাত জাতীয় রচনা যা বংশানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। কিতাবুল আনসাব খারিজীদের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। ইস্তাম্বুলে এ গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়া গিয়াছে। বার্লিনেও এর এক কপি আছে।

ইতিহাসচর্চা ছাড়াও তিনি ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ চর্চা করতেন। আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) ইব্রাহীম বিন-আব্বাস-আল-মসুলকে রোমান মাস অনুসারে খারাজ প্রদান ও তা আদায়ের তারিখ সম্পন্ধে একটি স্মরণিকা রচনা করবার জন্য নির্দেশ দেন। স্মরণিকা লেখার পর ইব্রাহীম দরবারে তা পড়ে শুনান। এতে খলিফা খুবই খুশি হন। কিন্তু, বালাযুরী ঈর্ষান্বিত হয়ে বলেন যে, এ স্মরণিকায় একটি ভুল আছে। কিন্তু কেউ এ ভুল আর ধরতে পারেনি। তখন বালাযুরী বলেন যে, স্মরণিকার লেখক আরবি মাস গণণার পদ্ধতিতে রোমান বা খ্রিস্টীয় দিন রাত্রির নিরিখে হিসাব করেছেন। খ্রিস্টান সন বা সময় গণনার রীতি হলো সূর্যাদয়ের মানদণ্ডে, আর আরবি বা ইসলামী মাস বা সময় পরিমাপিত হয় চন্দ্রের উদয় অস্তের আলোকে। বালাযুরীর এ যুক্তি শুনে এ স্মরণিকার লেখক তার অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে নিয়ে বালাযুরীর পরামর্শ অনুযায়ী তার নিজের ভুল সংশোধন করে নেন। ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, "আল বালাযুরীর লেখায় পাণ্ডিত্যের অযথা বড়াইয়ের কোন ছাপ নেই। তাঁর রচনা শুধু লেখনীর উত্তম পদ্ধতিই প্রদর্শন করে না, বরং হাদিস শাস্ত্রবিদদের বাঁধাধরা বেষ্টনী থেকে মুক্ত উৎকৃষ্ট সমাজ চেতনায় উদ্দীপ্ত সংস্কৃতবান ব্যক্তিত্বের কৌশল ও রুচিরও পরিচায়ক।"

বালাযুরীর লেখা সাবলিল। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি শুধু একজন ঐতিহাসিকই ছিলেন না, সে সাথে একজন ভূগোলবিদ ও কবিও ছিলেন।

---

৬. *"আরব জাতির ইতিহাস" ফিলিপ.কে. হিট্টি (অনু জয়ন্ত সিংহ, সুঁজতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্রসেনগুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩ পৃ-৩৭১।*

www.pathagar.com

অধ্যায় পঞ্চম

বিশ্ব ইতিহাস রচনা : আল-ইয়াকুবী ও আল তাবারী

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইতিহাস লেখা হত মাগাজি ভিত্তিক। অর্থাৎ মহানবী (স)-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস। ইরাকী ইতিহাস কেন্দ্রের মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাসচর্চায় এক নতুন মাত্রা আসে। এখানে মাগাজির সাথে সাথে খবর, কুলজি অর্থাৎ বংশ পরিচয় এবং এর সাথে সরকারি দলিল পত্র ব্যবহার করা হয়। অষ্টম শতাব্দীতে আল-ইয়াকুবীর (৮৯৮ খ্রি.) মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাসচর্চায় বিশ্ব ইতিহাস লেখার প্রচলন শুরু হয়। বিশ্ব ইতিহাস হলো পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, নবী, রাসূল, শাসক, দেশ, তাদের সমাজ সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও পতন অন্তর্ভুক্ত করে লেখকের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে ঘটনাসমূহ লেখা হয় তাকেই বিশ্ব ইতিহাস বলে। আল-ইয়াকুবী, আল-তাবারী, আল-বালাযুরী প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিক বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন।

আল-ইয়াকুবী (মৃঃ ৮৯৮ খ্রি. হিঃ ২৮৪)

আল-ইয়াকুবী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক। তিনি বিশ্ব ইতিহাস রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার পুরো নাম হলো আহমদ-বিন-ইসহাক-বিন-জাফর ইবনে ওয়ালিদ আল-ইয়াকুবী। তিনি ইতিহাসে "আল-ইয়াকুবী" হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ইমামিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শিয়া মুসলিম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-দিনাওয়ারির (মৃঃ ৮৯৫ খ্রি.)-এর সমসাময়িক। তিনি আর্মেনিয়া ও খোরাশানে তাহিরিদের অধীনে চাকুরি করেন। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় ভ্রমণ করেন এবং ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি "কিতাব-আল-বুলদান" নামে ভূ-ইতিহাস গ্রন্থ এবং "আল-তারিখ" নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। "কিতাব-আল-বুলদান" ৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রচনা। এটা ৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মিশরে রচনা করা হয়।

আল ইয়াকুবীর "তারিখ" গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনি বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে নবী, রাসূলগণের আগমন এবং মহানবী (স)-এর জন্মের আগ পর্যন্ত ইতিহাস লিখেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠির

www.pathagar.com

যেমন–পারশিক, সিরিয়, ব্যবিলনীয়, ভারতীয়, গ্রিক, রোমান, মিশরীয়, বার্বার, আবিসিনীয়, তুর্কী, চীনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি মহানবী (স)-এর জন্মের পর থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের ৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। তিনি তার অন্য "কিতাব-আল-বুলদান" নামক গ্রন্থে বিভিন্ন শহর ও নগরের ভৌগলিক অবস্থান, ও অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থ তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া।

আল-ইয়াকুবী তার লেখায় উৎসসমূহের সত্যতা নির্ণয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্টি ও নবীদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে একদম মূল উৎসের সন্ধান করেছেন। তিনি ইরানী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাসানীয় যুগের পূর্বের কাহিনী ও উপাখ্যান (গল্প)-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি তার লেখায় বেশি তথ্য উপাত্ত দেননি। তার ইতিহাস লেখায় মূল উৎসই ছিল সোলায়মান-বিন-আলী-আল-হাশেমী এবং মদিনা কেন্দ্রের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আল-ওয়াকিন্দি ও ইবনে ইসহাক। তিনি কুলজি বর্ণনায় ক্ষেত্রে আখবারিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আব্বাসীয়দের ইতিহাস আলোচনায় তিনি নমোনীয়ভাব পোষণ করতেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরকে (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি আব্বাসীয় আন্দোলনকে "হাশেমীয় আন্দোলন' বলেছেন। তিনি আব্বাসীয় শাসনকে ন্যায়বিচারক শাসনকাল বলেছেন। আবার আবু মুসলিম হত্যাকাণ্ড ও বার্মেকী বংশের পতনের কারণ সম্পর্কে তিনি যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি আব্বাসীয়দের মর্যাদা রক্ষায় যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। আল-ইয়াকুবির বিশ্ব-ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক আর.এ. নিকলসন বলেন, "দিনাওয়ারি সমসাময়িক ইবন ওয়াযিহ আল-ইয়াকুবি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অতুলনীয় সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেছিলেন। এই বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ লেখক নিজে আলী পরিবারের অনুগামী হয়েও প্রাচীন ও প্রকৃত শিয়া ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করেছেন। অধ্যাপক হাউৎসমা (লিডেন-১৮৮৩) দুটি খণ্ডে তাঁর রচনাটি সম্পাদনা করেছেন।"[১] ঐতিহাসিক ডি.এ. মার্গোলিয়থ বলেন, "যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের সুগভীরভাবে ইতিহাস অধ্যয়নের সময় বা ইচ্ছা নেই, তাদের ব্যবহারের জন্য আল-ইয়াকুবির কিতাব আল-বুলদানকে জাতীয় ইতিহাসের একটি উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত কোষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।"

---

১. *"আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" আর-এ. নিকলসন (অনু. ও সম্পাদনা) জয়ন্ত সিংহ, মুহাঃ আবদুল কাইউম, বিদ্যুৎ ব্যানার্জিও সৌমিত্র সেনগুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩ পৃ. ৩২৪।*

www.pathagar.com

তাবারি (৮৩৮-৯২৩ খ্রি.)

নবম দশম শতাব্দীতে আরব ইতিহাসচর্চার যে বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায় তার মূলেই ছিল তাবারি। তাবারি ছিলেন শুধু আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে নয় বরং সমগ্র মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি মদিনা ও ইরাকী ইতিহাস কেন্দ্রের চর্চাকে পরিহার করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসচর্চা শুরু করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ব্যাপক তথ্য দেন এবং তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস রচনা করেন।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারি ৮৩৮ সালে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূল বরাবর বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশ তাবারিস্তানের "আমূল" নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।[২] এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, "ওই প্রদেশের নাম থেকেই তাঁর নাম হয় তাবারি এবং এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।"[৩] তার পুরো নাম ছিল আবু জাফর মুহম্মদ ইবনে জাবির আত-তাবারি। তার পিতার নাম ছিল জাবির। তিনি তার পিতার কাছে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মাত্র ৭ বছর বয়সে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হন। ৮ বছর বয়সে নামাজে ইমামতি করেন এবং ৯ বছর বয়সে হাদিসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রথমে তিনি রাইয়ে যান। এখানে বিখ্যাত শিক্ষক মুহম্মদ-বিন-হুমায়েদের কাছে ১ লক্ষ হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। এর পর তিনি বাগদাদ, কুফা ও বসরাতে যান। আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন নগর বন্দরে ঘুরে বেড়ান। শেষে তিনি মিশরের ফুসতাতে আসেন এবং বিখ্যাত সাধক আলী-বিন সারাজ-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ শিক্ষক তাবারির জ্ঞান চর্চার খুবই প্রশংসা করেন ফুসতাত থেকে তিনি তাবারিস্তানে গমন করেন এবং ইমাম হাম্বলদের অনুসারীদের কোপে পড়েন। এর প্রধান কারণ ছিল যে, ইমামের অনুসারীরা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের নামে গালি গালাজ করতেন। তাবারি-এর প্রতিবাদ করেন।

---

২. *"আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" আর-এ নিকলসন (অনু. জয়ন্ত সিংহ, মুহাঃ আবদুল কাইউম, বিদ্যুৎ ব্যানার্জী ও সৌমিত্র সেন গুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩ পৃ-৩২৪, "আরব জাতির ইতিহাস "ফিলিপ. কে হিট্টি (অনু-জয়ন্ত সিং সেজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩ পৃ-৩৭২।*

৩. *"আরবি সাহিত্যের ইতিহাস" আর এ. নিকলসন প্রাগুক্ত পৃ-৩২৪।*

www.pathagar.com

শিয়া হয়েও তাবারি শিয়াদের এ জঘন্য কাজে বাধা দেন। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক মার্গোলিয়থ বলেন, "মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে তাবারি প্রথম ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে ও বিশ্লেষণ ভঙ্গিতে আলোচনা করেন এবং ঘটনার সন তারিখ সম্বন্ধে তার মন ছিল সচেতন।" আর ঐতিহাসিক আর. এ. নিকলসন বলেন, "শোনা যায়, শেষ ৪০ বছরে তিনি প্রতিদিন ৪০ পাতা করে লিখতেন।"[৪]

তিনি কোন সরকারি চাকরি গ্রহণ না করলেও আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল-এর প্রধান উযির উবায়দুল্লাহ-বিন-ইয়াহিয়ার সঙ্গে খলিফার পুত্রের শিক্ষক হিসেবে বহাল থাকেন। তার পৃষ্টপোষক ক্ষমতাচ্যুত হলে তিনি আবার বেকার হয়ে পড়েন তখন তার বয়স ছিল ২৩ বছর।

মৃত্যু

শেষ বয়সে তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। ৮৬ বছর বয়সে ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১০ হিজরিতে এ মহান ঐতিহাসিকের মৃত্যু হয়।

তাবারির রচনাবলি

'তারিখ-আল রসুল ওয়াআল-মুলুক" তাবাররি সর্বশ্রেষ্ট রচনা। তিনি সর্বপ্রথম ৩০ খণ্ডে" "জামি আল-বায়ান ফি তফসির আইয়েল কুরআন" নামে কুরআনের তফসির রচনা করেন। এছাড়া তিনি, "তাহযীব আল-আসার" নামে হাদিস সংকলন করেন। আমরা আগেই উল্লেখ্য করেছি যে তাবারির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ছিল, "তারিখ-আল-রসূল-ওয়াল-মুলুক"। এ গ্রন্থটি তিনি ১৫০ খণ্ডে অর্থাৎ ৩০,০০০ পৃষ্ঠায় লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীতে ১৫ খণ্ডে ৩,০০০ হাজার পৃষ্ঠায় লিখেন। এটি ছিল বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে শীর্ষ স্থানীয় এবং আরবি ভাষায় লিখিত বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা এ গ্রন্থ থেকে অকাতরে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "মিসকাওয়াইহ, ইবন-আল-আসীর ও আবু-আল-ফিদার মতো পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা তাঁর এই সুবিশাল বইটিকে নিজেদের কাজের নির্ভরযোগ্য উপাদান রূপে ব্যবহার করেন।"[৫] এ গ্রন্থে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি থেকে শুরু করে, নবী-রাসূল, বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠি, প্রাক-ইসলামী আরব, মহানবী (স)-এর জীবনী, খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় আমলের ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিখেছেন। তিনি তার

---

৪. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" ঐ পৃ-৩২৫।

৫. "আরব জাতির ইতিহাস" ফিলিপ কে. হিট্টি প্রাগুক্ত পৃ-৩৭২।

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন তথ্যের সাথে সাথে নিজে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে তারিখ ব্যবহার করেছেন। তিনি তার লেখায় সনদ ব্যবহার করবার তেমন একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ধর্মীয় ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ইসনাদ বা বর্ণনার সূত্র ব্যবহার করতেন। ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য ছাত্র আবু মুহম্মদ আল ফারগানি এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-হামদানি (মৃঃ ১১২৭ খ্রি.) তাবারির লেখাকে ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়ে যান।

সমালোচনা

তাবারির রচনা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। ঐতিহাসিক গীব তাবারির যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। তাবারি বিশালায়তন ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন অথচ তিনি ইসলামের ইতিহাসে কোন কোন Turning point অর্থাৎ যুগান্তকারী ঘটনাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি। যেমন বলা যায় তিনি মুসলমানদের স্পেন বিজয় মাত্র ৬ লাইনে শেষ করেছেন। যা তার মত লেখকের কাছ থেকে মোটেও আশা করা যায় না। আবার তিনি আল-ওয়াকিন্দির মত ঐতিহাসিকের মত বিশ্বাস করেননি এ কারণে যে ওয়াকিন্দি ইয়াহুদিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি বেশি বিশ্বাস করেছেন আখবারি ঐতিহাসিক সায়েক-বিন-উমরকে।

তাবারি ইতিহাসচর্চাকে কোরআন ও হাদিসের পরেই স্থান দিতেন। তিনি মনে করতেন জ্ঞানের তৃতীয় উৎস হলো ইতিহাসচর্চা। তাবারি ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লেখার তারিখের প্রচলন করেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম আরবি ভাষার আরব ঐতিহাসিক যিনি সর্বপ্রথম বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন। ঐতিহাসিক গীব বলেন, "তাবারির চরম উৎকর্ষের দিক হলো তাঁর প্রমানিকতা ও সর্বাত্মকতা, যা চলমান একটি যুগের অবসান ঘটিয়েছে, পরবর্তী কোন ইতিহাসবিদই ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস রচনার জন্য নতুন উপকরণ সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করার কাজে এত গভীর আত্মনিয়োগ করেনি। বরং তাঁরা হয় তাবারির সারবস্তু নিয়েছেন, না হয় তাবারি শেষ করেছেন, এরপর থেকে তাঁরা শুরু করেছেন।" আবার ঐতিহাসিক জর্জ মার্টন (১৯২৭ সাল) তাবারিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক (The greatest historian) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদিনা ও ইরাকি ইতিহাসচর্চা

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স) মদিনায় হিজরতের পরে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। মহানবী (স) ছিলেন ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু। তাই তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা লিখে রাখা প্রত্যেক মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এ সূত্র ধরে মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা। হিজরির তৃতীয় শতাব্দী অর্থাৎ নবম-দশম শতাব্দীতে মুসলিম ইতিহাসচর্চার বিকাশ কাল ধরা হয়। মুসলিম ইতিহাসচর্চার একটি উৎস ছিল মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র ও আরেকটি উৎস ছিল ইরাকের ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র।

মদিনার ইতিহাসচর্চা

মদিনায় মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। মদিনায় শিক্ষায়তনটির (স্কুল) নাম ছিল" "মাদ্রাসা-আল-মদিনা"। এ মাদ্রাসা ইতিহাসচর্চার প্রথম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এ কেন্দ্র মূলত মহানবী (স)-এর মাগাজী চর্চার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। শিক্ষা কেন্দ্র দু'জন ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে সবার কাছে পরিচিত লাভ করেন। এরা হলেন উরওয়া-বিন-যুবাইর-বিন-আল-আওয়াম এবং তার ছাত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-যহুরী।

উরওয়া-বিন-যুবাইর বিন-আল-আওয়াম ছিলেন হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা আসমা (রা)-এর পুত্র। হযরত আয়শা (রা) ছিলেন তার খালা ও মহানবী (স) ছিলেন তার খালু। তিনি হাদিস সংগ্রহ ও জ্ঞান অন্বেষণে সারাজীবন কাটিয়ে দেন। তার খালা হযরত আয়শা (রা)-এর কাছ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি হাদিস গ্রহণ করেছেন। তিনি মহানবী (স)-এর মাগাজী সংক্রান্ত হাদিস সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন। উমাইয়া খলিফারা তাকে মহানবী (স)-এর রিসালাতের যুগ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন এবং তিনি সে উত্তরগুলো বই আকারে উত্তর দিতেন। তিনি মাগাজি আলোচনায় যে ইতিহাসচর্চার শুরু করেছিলেন তার পূর্ণতা দেন তারই সুযোগ্য ছাত্র প্রখ্যত ঐতিহাসিক আল-যহুরি।

www.pathagar.com

মদিনার ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

নিম্নে মদিনার ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা

মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র ইসলামের ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র ছিল। তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। এখানে ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য কোরআন ও হাদিসের এ দুটি উৎসকে প্রধান স্থান দেয়া হত।

২. সিরাহ ও মাগাজী ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা

মদিনায় ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে সিরাহ অর্থাৎ মহানবী (স)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নিয়ে ইতিহাস লেখা হত। আবার মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে বিভিন্ন দেশের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে মাগাজী লেখা হত।

৩. সর্বপ্রথম মুসলিম ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র

মদিনার ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র ছিল মুসলিম ইতিহাসচর্চার সর্বপ্রথম কেন্দ্র। মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটে।

৪. লেখার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চা

মদিনা ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে শুধু শ্রবণ ও মৌখিক পদ্ধতির সাথে সাথে লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উরওয়া-বিন-যুবাইর, আল-যহুরি ইবনে ইসহাক মহানবী (স)-এর সিরাহ, মাগাজী লিখে রাখার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। মদিনার সনদ, হুদায়রিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন শাসকদের কাছে মহানবী (স)-এর পত্র হতে উপকরণ সংগ্রহ করা হতো।

৫. কোরআনের উদ্ধৃতি পেশ

যে কোন ঘটনাকে বুঝানোর জন্য কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করার রীতি মদিনা ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন– বদরের যুদ্ধের বর্ণনা, হিজরত, হুদায়বিয়ার সন্ধি বিভিন্ন যুদ্ধ হতে তথ্য দেয়া হত।

৬. কাব্য ও কবিতা ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা

মদিনা ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কাব্য ও কবিতা ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা। যেমন– আমরা দেখি ইবনে ইসহাক তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সীরাতে রাসূলুল্লাহ" গ্রন্থে প্রচুর কবিতা সংযোজন করেন।

www.pathagar.com

৭. প্রাক মুসলিম যুগ নিয়ে আলোচনা

মদিনা ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাক-মুসলিম যুগ নিয়ে আলোচনা। প্রাক মুসলিম যুগে আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস সন্ধ্যার মজলিসে আলোচনা করা হত। সে সব আলোচনা লিখে রাখা হত।

৮. কুলজি চর্চা

মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে কুলজি বা বংশ ভিত্তিক আলোচনা হত। যেমন– আল যহুরী কুলজি বর্ণনা এবং শুউবি কাহিনি তার ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মদিনার ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য

ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের সফলতা, ব্যর্থতার ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা। মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রেও তা প্রতিফলিত হয়। মদিনার ইতিহাস চর্চাকেন্দ্রে সিরাহ, মাগাজী ও অন্যান্য ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ধর্মের পথে, কল্যাণের পথে আহবান করা। এছাড়া এ ইতিহাসচর্চাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া মদিনা ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (৬৩৪-৪৪ খ্রি.) সময়ে ইরাক মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাউনি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে বসরা ও ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক ছাউনি রূপে প্রতিষ্ঠিত এ শহর দুটো ইরাকি ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করে। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রের সাথে ইরাকি ইতিহাসচর্চার পার্থক্য ছিল। ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র বিশ্ব ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

নিম্নে ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. খবর বা সংবাদ ভিত্তিক ইতিহাস

ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে খবর 'বা সংবাদ' ভিত্তিক ইতিহাস লিখিত হতো। প্রাক-ইসলামী আমল গোত্রীয় ধারার সংবাদ ও খবর সংগ্রহ সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসচর্চা ও লেখা শুরু হয়। আখবারি ঐতিহাসিকদের এ প্রচেষ্টায় মুসলিম ইতিহাসচর্চা ক্রমবিকাশ লাভ করে।

www.pathagar.com

২. কুলজি ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা

ইরাক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে "কুলজি" বা "বংশ" ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা হত। এ কুলজি আলোচনার মধ্য দিয়েই ইরাকি ইতিহাসচর্চা সূচনা হয়। প্রাক ইসলামী যুগ ও ইসলামের আবির্ভাবের পরে বিভিন্ন বংশের বীরত্ব গাঁথা ও অন্যান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চায় ঐতিহাসিকরা নিয়োজিত হয়। কুলজি বেত্তাদের আবির্ভাবের ফলে ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে কুলজির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৩. লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসচর্চা

ইরাক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের আখবারি ও কুলজিবেত্তারা মৌখিক উৎসের পাশাপাশি লিখিত উৎসের উপর গুরুত্ব দিত বেশি।

৪. সনদ ব্যবহারের শিথিলতা

সনদ প্রায় ব্যবহারই হত না ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে এখানে সনদ ব্যবহারে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

৫. রেওয়ায়েত হতে তথ্যসমূহ

আখবারি ঐতিহাসিক ও কুলজি বেত্তাগণ পারিবারিক, ইরাকের গোত্রীয় রেওয়ায়েত ও অধিক সংখ্যক ব্যক্তির রেওয়াতে হতে তথ্য গ্রহণ করে ইতিহাসচর্চা করে।

৬. ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি

মৌখিক ও লিখিত উভয় উৎসের উপর নির্ভর করে ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লিখিত ইতিহাস ছাড়াও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা লেখা হত। এখানে অনেক জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও থাকতো।

৭. ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য

ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য ছিল প্রাক ইসলামী ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের গোত্রীয়, বংশীয় শাসনের ইতিহাস লিখে রেখে তা সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে ইতিহাসের প্রতি ভালবাসা তৈরি করা। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করাও ছিল ইরাকি ইতিহাসচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মদিনা ইতিহাসচর্চা ও ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে মদিনার ইতিহাসচর্চা ও ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

www.pathagar.com

১. সূচনার দিক দিয়ে

মদিনার ইতিহাসচর্চার শুরু হয় ইসলামের প্রথম দিকে। আর ইরাকে ইসলামের বিস্তৃতির পর ইতিহাসচর্চা শুরু হয়।

২. মাগাজী ও গোত্র ভিত্তিক

মদিনার ইতিহাসচর্চা ছিল মাগাজী ভিত্তিক। এখানে মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হত বেশি। আর ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের বিষয়বস্তু ছিল গোত্র ভিত্তিক। এটা ছিল খবর ও কাহিনী ভিত্তিক।

৩. সনদ ব্যবহারের দিক দিয়ে

মদিনার ইতিহাসচর্চার সনদ ব্যবহার ছিল আবশ্যকীয়। আর ইরাকি ইতিহাসচর্চায় সনদ ব্যবহার শিথিলতা দেখা যায়।

৪. লিখিত উৎস

মদিনা ইতিহাস কেন্দ্রের উপাদান ছিল মৌখিক। এখানে কবিতার আশ্রয়ও নেয়া হত। পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দেয়া হত। কিন্তু ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি লিখিত উৎসের উপর নির্ভর করা হত।

মুসলিম ইতিহাসচর্চার কেন্দ্র হিসেবে মদিনার ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র ও ইরাকি ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মদিনা ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ অর্থাৎ মাগাজী ভিত্তিক। আর ইরাকি ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রের ইতিহাসচর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। তবে উভয় কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একই। আর তা হলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লিখিত আকারে তা পৌঁছে দেয়া।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষণধর্মী এবং উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস রচনায় বহুমাত্রিক পদ্ধতি আল-মাসুদি, খতিব-আল-বাগদাদি, ইবনে খাল্লিকান

আল-মাসুদি

পরিচয়

আল-মাসুদি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। বাগদাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম হলো আল-হাসান-আলী-বিন-আল-হোসাইন-আল-মাসুদি। তিনি মহানবী (স)-এর সাহাবী বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বংশধর ছিলেন। এজন্য তিনি "মাসুদি" হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত।

দেশ ভ্রমণ

আল-মাসুদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, ও দার্শনিক ছিলেন। ঐতিহাসিক তাবারির মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাস রচনার যে সূচনা হয় তা পরিপূর্ণ রূপ দান করেন আল-মাসুদি। তিনি স্পেন, রাশিয়া, চীন, ভারত, সিরিয়া ও মিশর ভ্রমণ করেন। এভাবে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে সেসব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন।

মাসুদির গ্রন্থসমূহ

আল-মাসুদির বিখ্যাত গ্রন্থ হলো "কিতাব আল-যামান"। এটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এ গ্রন্থটির সাথে "কিতাব-আল-আসওয়াত" নামে একটি খণ্ড সংযোজিত হয়েছে। এ খণ্ডে ইসলামের ইতিহাস বহির্ভূত অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলির তারিখ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ঐতিহাসিক আল-মাসুদি এ সমগ্র গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেছেন তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "মরুজ-উয-যাহাবওয়া মাআদিন আল-জাওয়াহিরে।" এর বাংলা অর্থ হলো স্বর্ণের প্রান্তর ও বহু মূল্যবান পাথরের খনি। ৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ গ্রন্থ হলো বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ। "কিতাবুল তামবিহ" ও

www.pathagar.com

"মিরাত-উয-যামান" নামে আরো দুটো ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক খোদাবক্সের ভাষায়, "Certainly his book stands unrivalled in its combination of instruction and amusement." অর্থাৎ "তাঁর গ্রন্থ পাঠে অধ্যয়ন ও আনন্দ উভয়ই লাভ করা যায়। সেদিক থেকে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই।"

আল-মাসুদির ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য

নিম্নে মাসুদির ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. মাসুদি বংশানুক্রমিক ইতিহাস লেখার পরিবর্তে বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস লিখেন।

২. মাসুদির ইতিহাস রচনা ছিল ব্যাপক। কারণ তিনি মুসলমানদের ইতিহাসের সাথে ভারত, ইরান, গ্রিক, রোমান সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে তার গ্রন্থকে বিশ্বকোষের মর্যাদা দেন।

৩. আল-মাসুদির হাতে মুসলিম ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। সভ্যতার উত্থান, পতনের কারণ সম্বন্ধে তিনি ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ভৌগোলিক ও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণ সম্বন্ধে বলেছেন। ঋতু পরিবর্তন, জলবায়ু, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি মানুষের উপর কি প্রভাব পড়ে তা ঐতিহাসিক মাসুদি নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন।

৪. আগের ঐতিহাসিকদের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনীতি ও সামরিক দিক। কিন্তু মাসুদির লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৃতত্ত্ব, সমাজ এবং সংস্কৃতি। যা তিনি তার লেখায় সংযোগ করেছেন।

৫. মাসুদি পুরাতন তথ্য পরিহার করে নতুন তথ্য গ্রহণ করেন। তিনি তার গ্রন্থে তথ্য সুন্দরভাবে সাজান।

মাসুদির ইতিহাস দর্শন

ঐতিহাসিক মাসুদি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সে জায়গা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তা তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাসুদির এ ইতিহাস প্রীতিকে De Boer "Medicine of his soul" বলেছেন। তার মতে, "মানুষ আসে ও যায় কিন্তু ইতিহাস তাদের জ্ঞানানুশীলন ও কীর্তির কথা লিপিবদ্ধ করে রাখে এবং অতীতের ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং ঘটনাবলির ও নানা মানুষ সম্পর্কে নিরাসক্ত চিত্র তুলে ধরে।" মাসুদি উল্লেখ করেন যে, কোন জাতির আইন রূপরেখা ৪টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন– (ক) সে জাতির ধর্ম, (খ) অর্থনীতি, (গ) তাদের স্বভাব, চরিত্র ও (ঘ) প্রতিবেশী জাতিসমূহের

www.pathagar.com

প্রভাব। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের সম্পর্কে মাসুদির ধারণার জন্য প্রখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাকে "ইতিহাসের জনক" বলে প্রশংসা করেছেন। ইবনে খালদুনের আগে মাসুদি বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসের ধারণা দিয়েছেন।

মাসুদিকে আরবদের হিরোডোটাস বলার কারণ

প্রখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারার উপস্থাপনের প্রয়াস পান। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই-বাছাই করে ইতিহাস লিখতেন। এজন্য অর্থাৎ সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস লেখার জন্য হিরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ঠিক তেমনি আল-মাসুদিও হিরোডোটাসের মত বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মুসলিম ইতিহাসচর্চায় বংশভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রচলন করেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকতেন। এজন্য তাকে "আরবদের হিরোডোটাস" বলা হয়।

মৃত্যু

এ মহান ঐতিহাসিক ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৩৪৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

সমালোচনা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গীব মাসুদিকে "শ্রেষ্ঠ আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম" বলেছেন। তার মতে, "মাসুদির রচনা পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আরব ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। সে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান চর্চা।" মাসুদি একজন ঐতিহাসিক নন ভৌগোলিকও বটে। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে তার গ্রন্থে লিখেছেন। বইয়ের ভূমিকায় মাসুদি উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি অন্তত ৫০টির বেশি গ্রন্থ পাঠ করেন। মাসুদি প্রথম মুসলিম ও অ-মুসলিম উভয় ইতিহাস পাঠ করে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার রচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর মতে, আবহাওয়া ৫টি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন– ঋতুসমূহ, নক্ষত্রসমূহের উদয় ও অস্ত, বায়ুমণ্ডলের অবস্থান এবং সব শেষে সমুদ্রের অবস্থান।

www.pathagar.com

মাসুদি বিভিন্ন দেশের পাহাড়, পর্বত, রীতিনীতি, নদ-নদী, সাগর এবং বিভিন্ন বংশ ও রাজ্যের বিবরণী লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন নগরেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

তাবারির পর মুসলিম ইতিহাসচর্চায় আল-মাসুদি বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ও দার্শনিক। তিনি ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রুপদান করতে চেষ্টা করেন। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। কাজেই তাকে প্রকৃতপক্ষে "আরবদের হিরোডোটাস" বলা হয়ে থাকে।

খতিব আল বাগদাদী

পরিচয়

প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা ও ঐতিহাসিক খতিব-আল-বাগদাদী ১০০২ খ্রিস্টাব্দে ৩৯২ হিজরিতে তাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে বাগদাদের নিম্নাংশে দারযিজান-নামক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম হলো : আবু বকর আহমদ-বিন-আলি-বিন-সাবিত। তবে তিনি ইতিহাসে "খতিব আল বাগদাদী" হিসেবে পরিচিত। তার পিতার নাম ছিল আলি, তিনি ও তার পিতা উভয়েই বাগদাদ জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষা শেষ করবার জন্য আরো জ্ঞান অর্জন করবার জন্য বসরা, নিশাপুর, ইস্পাহান, হামদান ও দামেস্ক ভ্রমণ করেন। তিনি হাদিসবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। একবার তিনি মক্কায় যমযমের পানি খাবার সময়ে তিনটি ইচ্ছা করেছিলেন। আর তা হলো (ক) তিনি বাগদাদের ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করবেন, (খ) তিনি বাগদাদ শহরের আল-মনসুর মসজিদে বয়ান করবেন ও (গ) তার মৃত্যুর পর যেন তাকে বিশর-এর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। তার সব আশাই পূর্ণ হয়।

তার শিক্ষা গুরুদের মধ্যে একজন ছিলেন কারিমা বিনতে আহমদ নামে একজন মহিলা। এ মহিলা ছিলেন মার্ভের অধিবাসী।

খতিব আল বাগদাদী হাম্বলী মাযহারে অনুসারী থাকলেও পরে তিনি শাফেয়ী মাযহারের অনুসারী হন। তিনি হাম্বলী মাযহাব পরিত্যাগ করলে হাম্বলী মাযহারের অনুসারীরা তার শত্রুতে পরিণত হয়। তারা তাকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু, আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইম ও তার মন্ত্রী ইবনে আল-মুসলিমার জন্য তারা ব্যর্থ হন। খতিব আল-বাগদাদী বাগদাদের মসজিদে হাদিস পাঠ দানের নিয়মিত প্রক্রিয়া চালু করেন। আল-বাসাসিরী বাগদাদে এসে ক্ষমতা দখলের পর তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে যান এবং আলেপ্পোয় আত্মগোপন করেন। এরপর সেলজুকরা আব্বাসীয় খলিফার ত্রাণকর্তা হিসেবে আসলে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন (১০৭০ খ্রি.)।

www.pathagar.com

খতিব আল বাগদাদীর লেখার মূল বিষয়বস্তু হলো বাগদাদের ইতিহাস। এটি মূলত জীবন অভিধান। এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো বাগদাদ নগরীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী নিয়ে আলোচনা। এ গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে শহরের বর্ণনা। এরপর রয়েছে হাদিসের কলাকৌশল সংক্রান্ত বইয়ের তালিকা। এ জীবনী গ্রন্থে রয়েছে ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুর সন, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের বংশের বর্ণনা, শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষা-জীবন সংক্রান্ত তথ্য, কখনো কখনো দৈহিক গঠন তথ্য ও লেখা আছে। খতিব আল-বাগদাদী তার বইয়ের এক অংশে বাগদাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, পুল ও আরেক অধ্যায়ে খননকৃত খালসমূহের পরিচয় দেন।

বাগদাদ নগরীর জন-জীবন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বাগদাদে খলিফা আল-মুকতাদিরের সময়ে (৯০৮-৯৩২ খ্রি.) ২৭০০ গণ শৌচাগার ও গোসলখানা ছিল। খতিব আল বাগদাদী প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তার সংগ্রহে অনেক বই ছিল। তিনি এসব বইগুলো মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ বইগুলো তার এক বন্ধুর বাড়িতে সংরক্ষিত হয়েছিল।

তার গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থের বিষয়বস্তু

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো "কিফায়া ফী মারিফাতে উসুল ইলম আল-রেওয়াআ," "তাকয়িদ আল-ইলম," "আল-জামি লি আখলাক আল-রাবী ওয়াল সামী," "আল-তাফসীল লি মুবহাম আল-মারাসিল," "আল-ইজাযা লিল মাদুল ওয়াল মাজহুল" প্রভৃতি। তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "তারিখ বাগদাদ" ও "তারিখ মদিনাতুস সালাম"। "তারিখ বাগদাদ" নামক গ্রন্থে এ নগরীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচনাই এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। তিনি নগর ও শহরের অধিবাসীদের উপর বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইয়েম (১০৬০-১০৭৫ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

মৃত্যু

তিনি স্থায়ীভাবে বাগদাদ বসবাস করেন। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে খাল্লিকান

একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মুসলিম জীবনী কোষ লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন ইবনে খাল্লিকান । জীবনী কোষ লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি জাতির ইতিহাস রচনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বিশ্লেষণ ধর্মী জীবনী কোষ বা জীবন চরিত রচনা করে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

www.pathagar.com

পরিচয়

১২১১ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর ৬০৮ হিজরির রবিউস সানি মাসের ১১ তারিখে কুর্দিস্তানের ইরবিলে বার্মেকী বংশের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম হলো শামসউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহম্মদ বিন ইব্রাহীম আল-বার্মেকী। তবে তিনি ইতিহাসে "ইবনে খাল্লিকান" হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় শাসনামলে বিখ্যাত উযির পরিবার" বার্মেকী বংশের" প্রতিষ্ঠাতা খালেদ বিন-বার্মাকের বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন একজন শিক্ষক। তার জন্মের মাত্র ২ বছর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে ইবনে শাদ্দাদের কাছে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন এবং ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে দামিশকে ইবনে সালাহের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা শিক্ষা লাভ করেন। তার সাথে বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসির ও কামালউদ্দীন ইবনে ইউসুফের সাক্ষাৎ ঘটে।

কর্ম জীবন

ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খাল্লিকান মিশরে আসেন। সেখানে তিনি কাজিউল-কুজ্জাত বদরউদ্দীন ইউসুফ বিন হাসানের ডেপুটি হিসেবে তার কর্ম জীবন শুরু করেন। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ নিয়োগ লাভ করেন। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে মিশরে মামলুক বংশ প্রতিষ্ঠিত। হলে মামলুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকও এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ও বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বাইবার্স (১২৬১-১২৭৭ খ্রি.) তাকে মিশরের কাজিউল কুজ্জাতের পদ দেন। এ পদে তিনি সিরিয়ার সম্পূর্ণ বিচারের মহান দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি হানাফী, হাম্বলী ও মালেকী মাজহাবের লোকদেরকে তার ডেপুটি নিযুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান বাইবার্স ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত তিন মাজহাবের বিচারককে কাজিউল কুজ্জাতের পদ দিলে তিনি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রধান কাজীর অর্থাৎ কাজীউল কুজ্জাতের পদ হারান। এরপর তিনি সিরিয়ায় আসেন। সেখানে তিনি "আল-ফখরিয়া" কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মামলুক সুলতান বাইবার্সের মৃত্যুর পর সিরিয়ার কাজিউল কুজ্জাতের পদ পুনরায় পান। কিন্তু, তার ভাগ্য তার জন্য সুপ্রসন্ন ছিল না। কালাউন যখন মিসরের মামলুক সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন কালাউনের বিরুদ্ধে দামেস্কের শাসনকর্তা কারা সুনকুর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইবনে খাল্লিকান কারা সুনকুর পক্ষে সুলতান কালাউনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। কারা সুনকুর বিদ্রোহ দমন করে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে কালাউন কায়রোতে সৈন্য বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন। ইবনে খাল্লিকানকে বন্দি করা হয় সুলতানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেবার জন্য। ৩ মাস পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। সুলতান তাকে পুনরায় কাজিউল কুজ্জাতের পদ দেন।

www.pathagar.com

মৃত্যু

১২৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর ৬৮১ হিজরির ২৬ রজব তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে খাল্লিকানের গ্রন্থের বিষয়বস্তু

ইবনে খাল্লিকানের "ওয়াফায়াত আল আয়্যান ওয়া আনান আল-জামান" বিখ্যাত জীবন চরিত গ্রন্থ। ইবনে খাল্লিকান ৮৬৫ জন মুসলিম মনীষির জীবনী লেখেন। এটিই ছিল আরবি ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম জাতীয় জীবন রচিত অভিধান। তিনি তার গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন," আমি আমার এই বইটিকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তির, রাজা, আমীর, উজির বা কবিদের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ রাখিনি। কিন্তু জনসাধারণ সমস্ত নামের সঙ্গে পরিচিত এবং যাদের সম্পর্কে প্রায়ই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের সকলের কথাই আমি এর মধ্যে বলেছি।"[৭] তিনি তার বইয়ে মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের কোন জীবনী লিখেননি। কারণ তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী জীবনী গ্রন্থ উপহার দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন চরিত বিষয়ে একটি প্রামাণ্য হাত বই বা Hank Book রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি পদ্ধতিগত দিক দিয়ে সচেতন ভাবেই নামের বর্ণনাক্রমিক ধারাবাহিক ভাবে এ গ্রন্থ লিখেন। তিনি নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। জীবন চরিত রচনায় তিনি নামের সঠিক বানান, সন-তারিখ, বংশ বৃত্তান্ত, ঘটনার সত্যতা নির্ণয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি প্রভৃতি টীকা-টিপ্পনী সহ আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, "ইবনে খাল্লিকান এ কথাও বলতে পারতেন যে, তিনিই প্রথম মুসলিম লেখক হিসেবে একটি জাতীয় জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেছেন, কারণ তার পূর্ববর্তীদের কেউই একটি একক বইয়ের মধ্যে প্রতিটি শ্রেণির বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবনী সংকলিত করার কথা চিন্তা করেননি।"[৮] এ গ্রন্থটি তিনি ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা আরম্ভ করেন এবং ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা শেষ করেন।

জীবনী বর্ণনা করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার গ্রন্থে সমসাময়িক রাজনীতির বিশেষ বিশেষ দিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা করেছেন। সেলজুক সুলতানদের সম্পর্কে, সেলজুক সুলতান মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) তার

---

১. *"আরবি সাহিত্যের ইতিহাস" আর এ নিকলসন (অনু ও সম্পাদনা, জয়ন্ত সিংহ, মুহাঃ আবদুল কাইউম, বিদ্যুৎ ব্যানার্জি ও সৌমিত্র সেন গুপ্ত) কোলকাতা ২০০৩ পৃ-৪২৫।*

২. *"আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" আর-এ-নিকলস" প্রাগুক্ত পৃ-৪২৫।*

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী নিয়াম-উল-মুলক তুসী (১০১৮-১০৯২ খ্রি.)-এর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উজিরদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, সুলতানদের বসে থাকা এবং মৃগয়ায় (শিকার) সময় কাটানো ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোর সুলতানের উজির কাজি আকরাম জামাল-উদ-দীনের কাছে ইবনে খাল্লিকান এক চিঠি লিখেন। এ চিঠিতে মোঙ্গল, মার্ভ, খোরাশান প্রভৃতি বিষয়ে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য ফুটে ওঠে এবং এ চিঠির মাধ্যমে তার ইতিহাস চেতনা ও দর্শনের এক উজ্জ্বল নিদর্শনও পাওয়া যায়। তার মতে খোরাশান ও মার্ভ ছিল "কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই বেহেস্তের অবিকল কপি।" খোরাশান ও মার্ভের কবি, পণ্ডিত ব্যক্তি, চিন্তাবিদ, সুফী, বিজ্ঞানী প্রমূখের তিনি ভূয়সি প্রশংসা করেছেন এবং হতাশার সুরে বলেছেন যে, মোঙ্গল আক্রমনে ঐ অঞ্চলের প্রাসাদসমূহ এবং সব প্রতিষ্ঠান ও স্থাপত্যাদি ভুলুণ্ঠিত : "এটা আজ প্যাঁচার কর্কশ কণ্ঠস্বর আর মরুভূমির লু হাওয়ার গোঙ্গানিতে ভরপুর।"

মূল্যায়ন

ইবনে খাল্লিকানের লেখা সহজ-সরল তার লেখা উন্নত রুচিবোধের পরিচায়ক। তার গ্রন্থটি বিশ্বস্ত ও প্রামানিক গ্রন্থ। ইবনে খালিক্কান তার গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকরা তার গ্রন্থ থেকে যথেষ্ঠ সাহায্য লাভ করতে পারে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইউলিয়াম জোনসের সাথে একমত হয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর. এ. নিকলসন বলেন, "এটি (অর্থাৎ ইবনে খাল্লিকানের জীবনী গ্রন্থ) এ পর্যন্ত লিখিত সর্বোত্তম সাধারণ জীবনী গ্রন্থ, যা আধুনিক যুগের একমাত্র বসওয়েলের জনসন-এর সাথে তুলনীয়।"

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

দরবারি ইতিহাস ও দরবারি ঐতিহাসিক : নিযাম-উল-মুলক তুসি

মধ্যযুগে মুসলিম ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান উযির ছিলেন নিযাম-উল-মূলক তুসী। সেলজুক বংশের (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.) সর্বশ্রেষ্ঠ উযির ছিলেন তিনি। সেলজুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তার বিচক্ষণতার জন্য মালিক শাহের রাজত্বকাল স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "তাঁকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অলংকার বলে আখ্যা দেওয়া যায়।"[১] ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন, 'মালিক শাহের রাজত্বকালসহ মোট কুড়ি বছর ধরে নিজাম উল-মুলক তাঁর নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। আর সুলতান কেবলমাত্র সিংহাসনে বসে থাকতেন বা শিকারের পিছনে ধাওয়া করাটা উপভোগ করতেন।"

পরিচয়

নিযাম-উল-মূলক ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের তুসের নিকটবর্তী রাকন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম ছিল আবু আলী আল হাসান ইবনে আলী ইবনে ইসহাক আল তুসী। তিনি ইতিহাসে "নিযাম-উল-মূলক" হিসেবে পরিচিত।

উযির হিসেবে কৃতিত্ব

আলপ-আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.) ও মালিক শাহের (১০৭২ – ১০৯২ খ্রি.) রাজত্বকালে তিনি ছিলেন প্রধান উযির। মালিক শাহের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। মালিক শাহ তাকে "আতাবেগ" উপাধিতে ভুষিত করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা– প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। মালিক শাহের রাজত্বকালের গৌরবের জন্য তার প্রধানমন্ত্রী নিযাম উল-মুলকের অবদান ছিল অপরিসীম। যখন সিংহাসনকে কেন্দ্র করে মালিক শাহ ও তার ভাইয়ের মধ্যে

---

১. *"আরব জাতীর ইতিহাস" ফিলিপ কে হিট্টি (অনু জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) কোলকাতা ২০০৩, পৃ-৪৬৫।*

www.pathagar.com

ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের সূচনা হয় তখন নিযাম-উল-মুলক মালিক শাহের পক্ষাবলম্বন করেন। নিযাম-উল-মুলক সুন্নী ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। তার অসাধারণ বিচক্ষণতা, কর্মকুশলতা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে মালিক শাহের রাজত্বকাল 'স্বর্ণ শিখরে' আরোহণ করে।

জালালী পঞ্জিকা (ক্যালেন্ডার) প্রবর্তন

১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে নিযাম-উল-মুলকের পরামর্শে মালিক শাহ নিশাপুরে ৭০ জন জ্যোতির্বিদদের এ মহাসম্মেলন আহবান করেন। এতে উক্ত সম্মেলনের জ্যোতির্বিদদের কাছে পারসিক পঞ্জিকার সংস্কারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা চন্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস গণনার প্রথা চালু করেন এবং প্রচলিত গণনা পদ্ধতির সব ভুল প্রথা সংশোধন করে এক নতুন সন প্রবর্তন করেন। উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত জ্যোর্তিবিদ ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ওমর খৈয়াম। সুলতান জালাল-উদ-দীন মালিক শাহের নামানুসারে এ সনের নাম "জালালী সন" রাখা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "এই গণনা নির্ভুলতায় জুলিয় গণনাকে অতিক্রম করে গ্রেগরীয় গণনার কাছাকাছি পৌঁছেছিল।" আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বর্তমান সময়ের প্রচলিত গণনা পদ্ধতির চেয়ে এ গণনা পদ্ধতি অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও নির্ভুল ছিল। তার প্রচেষ্টায় নিশাপুরে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক

তিনি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাগদাদে ১০৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসা নামে ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাররোয় স্থাপিত ইসমাইলীয় শিয়াদের অর্থাৎ ফাতেমীর খলিফাদের প্রতিষ্ঠিত "আল আজহার" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সাফেয়ী ও আশয়ারী মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম গাজ্জালি (রহ) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.)। মহাকবি শেখ সাদি ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিযাম-উল-মুলকের পৃষ্ঠপোষকতায় হযরত ইমাম গাজ্জালি (রঃ) শিয়া মতবাদের সমালোচনা করে সুন্নী ইসলামের প্রভুত্ব কায়েম করেন।

গ্রন্থ রচনা

তিনি ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি "নিয়ামতনামা," "মাজমাউল ওয়াসায়া," "কিতাবুল ওয়াসায়া" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তার অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো "সিয়াসতনামা"[২] গ্রন্থ। এটা রাষ্ট্র দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি

---

২. *"সিয়াসত নামা" নিজাম-উল-মুলক (অনু যাহিদ হোসেন) ঢাকা-১৯৯৩।*

www.pathagar.com

তার রাষ্ট্র দর্শন ব্যাখ্যা করেন। সরকারের কি চরিত্র হওয়া উচিত, কিভাবে দেশ শাসন করতে হয়। বিদ্রোহীদের কিভাবে বিচার করতে হয়, জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক, বিচার, রাজপ্রতিনিধি এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে ব্যবহার, পশুর খাদ্য মজুদ, সৈন্যদের বেতন পরিশোধ, গুপ্তচরে ব্যবস্থা প্রবর্তন, উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা ও তাদের ভাতা ও সুযোগ সুবিধা[৩] ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থটি লেখেন সুলতান মালিক শাহকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপদেশ দেবার জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাকে ম্যাকিয়াভেলীর পূর্বসুরী বলা যায়। তাদের মধ্যে মিল ও অমিল দুটোই রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের দুজনের নীতি ছিল বাস্তব। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল নিযাম-উল-মুলকের নীতি ছিল জনগণের কল্যাণ আর ম্যাকিয়াভিলির নীতি ছিল রাজা ও রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা। নিযাম-উল-মুলক তার এ গ্রন্থটি প্রথমে ৩৯টি অধ্যায় সমাপ্ত করেন। পরে আরো ১১টি অধ্যায় যোগ করার পর এ গ্রন্থের অধ্যায় দাঁড়ায় ৫০টি। তিনি চমৎকার কাহিনী, গল্প ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি সাজান।

প্রজানুরঞ্জক

তিনি ছিলেন প্রজানুরঞ্জক উযির। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসীর বলেন, "তিনি তার সদগুণাবলি ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য উচু-নিচু নির্বিশেষে সবার কাছে সমাদৃত ছিলেন।"

মৃত্যু

উগ্রপন্থী ইসমাইলীয় পন্থী হাসান-বিন-সাবা যিনি "পর্বতের বৃদ্ধ লোক (Old man the Mountain)" নামে পরিচিত তিনি ছিলেন নিযাম-উল-মুলকের সহপাঠি ও বন্ধু। কিন্তু সেলজুক দরবারে নিযামের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেলে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে "গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায়" নামে একটি জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলেন। এ গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায়ের একজন নিযাম-উল-মুলককে ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করেন।

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে নিযাম-উল-মুলক ছিলেন অন্যতম। ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে, "এশিয়া যে সকল উযীর ও শাসকের জন্মদান করিয়াছে তন্মধ্যে ইয়াহিয়া বারমিকির পর নিজামুল মুল্‌কই সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৪]

---

৩. *"সিয়াতনামা" নিজাম-উল-মুলক (অনু. যাহিদ হোসেন) প্রাগুক্ত।*

৪. *"আরব জাতির ইতিহাস" সৈয়দ আমীর আলী (অনু-শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ) ঢাকা-১৯৯৫ পৃ-২৭০।*

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ইতিহাসচর্চায় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা– ইবনে খালদুন : "আল মুকাদ্দিমা" এবং "কিতাব আল-ইবার"

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুন বিশ্বের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী নাম। তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, সমাজ বিজ্ঞানী। তাকে সমাজ তাত্ত্বিক ঐতিহাসিকও বলা যায়। তিনি ছিলেন ইতিহাস দর্শনের জনক।

পরিচয়

ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের (১১ রমজান ৭৩২ হিঃ) উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তার পুরো নাম হলো ওয়ালীউদ-দীন-আবু যায়েদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর মুহম্মদ বিন আল-হাসান। ইবনে খালদুন তার পারিবারিক নাম।

ইবনে খালদুনের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন দক্ষিণ আরবের ইয়ামেনী হাযরামউতের বংশোদ্ভুত। তার পরিবার– সপ্তম শতকে মুসলিম স্পেনের আন্দোলুসিয়াত থেকে তিউনিসে চলে আসেন। তিনি নিজেকে আরব হিসেবে পরিচয় দেন না। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইবারের" শেষ খণ্ডের কিছু অংশে তার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্লেগের মহামারীতে তিনি তার পিতা মাতাকে হারান। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা শেষ করেন। তিনি পবিত্র কোরআন, হাদিস, মালেকী মাজহাবের ব্যবহার শাস্ত্র, ফিকহ শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ছন্দ, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

---

১. *"লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব ইবনে খালদুন" মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইনান (অনু. ইফতেখার আমিন) ঢাকা-২০০৪।*

www.pathagar.com

কর্মজীবন

ইবনে খালদুনের কর্ম জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময়। তাকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কোন কোন সময় তিনি বিশেষ একজনের পক্ষাবলম্বন করেন। তার জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়। তিনি মরক্কোর সুলতান আবু ইনানের অধীনে তার উলেমা পরিষদে সভ্য ছিলেন। তিনি তার সচিব ও সীলমোহরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সুলতান আবু ইনানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং এ ষড়যন্ত্র ফাস হয়ে গেলে বন্দী হন। তিনি ২ বছর কারাভোগ করেন। সুলতান আবু ইনানের মৃত্যুর পর তার মন্ত্রী আল-হাসান ইবনে খালদুনকে মুক্তি দিয়ে পূর্বের পদে বহাল করেন। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিশরের রাজধানী কায়রোতে এসে উপস্থিত হন। তিনি কায়রোর চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হন। ঠিক এ সময় মিশরের মামলুক সুলতান আল-যহীর বারকুক (১৩৮২ – ১৩৯৮ খ্রি.) ইবনে খালদুনকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করেন। তাকে বিশ্ববিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে-নিযুক্ত করেন। এর দু'বছর পর ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মালেকী মাযহাবের প্রধান কাজীর পদ দেন। এছাড়াও তিনি ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদের অধীনে সরকারি কাজে যোগদান করেন। তিনি ক্যাস্টিলিয়ান রাজা পেড্রোর দরবারের শান্তি মিশনের সদস্য ছিলেন। দু'বছর পর তিনি এক বন্ধু আল-খাতিবের রোষানলে পড়ে তিনি মাগরিবে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় চলে আসেন। এ ছাড়াও তিনি ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বারকুফের উত্তরাধিকারী আন-নাসির ফারাজের বিশ্ববিখ্যাত ত্রাস তৈমুর লং (১৩৬৬ – ১৪০৪ খ্রি.) বিরোধী অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। তৈমুর লং ইবনে খালদুনকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। ইবনে খালদুন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা, মিশর, মরক্কো, আরব দেশগুলো, পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ইউরোপ, স্পেনসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেন।

আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা

ইবনে খালদুন বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তাই তিনি ১৩৭৫-১৩৭৯ খ্রি. এ ৪ বছর আলজেরিয়ার কালাত ইবনে সালামাহ' নামক দুর্গে বসে সব ঝামেলা থেকে দূরে থেকে তিনি "মুকাদ্দিমা" রচনা সমাপ্ত করেন। "মুকাদ্দিমা" হলো ইবনে খালদুনের বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইবারের" ভূমিকা। কারণ আরবিতে ভূমিকাকে "মুকাদ্দিমা" বলে। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইবার" ৭ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। প্রথম খণ্ডটি হলো "মুকাদ্দিমা" বা ভূমিকা বা মুখবন্ধ।

www.pathagar.com

আল-মুকাদ্দিমা

"কিতাবুল ইবার" নামে ইবনে খালদুন যে গ্রন্থ রচনার পকিকল্পনা করেন তার ভূমিকা হলো আল-মুকাদ্দিমা।" তিনি "মুকাদ্দিমাকে" ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের অনেক উপ-শিরোনামে বিভক্ত। মুকাদ্দিমার অধ্যায়গুলো হলো :

প্রথম ভাগ : ইবনে খালদুন তার 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থের প্রথম ভাগে সামাজবিজ্ঞানের একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় ভাগ : দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন যাযাবর শ্রেণির ও সমাজের উত্থান, ক্রমবিকাশ এবং অনুরূপ উপগোত্র ও গোত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি পূর্বাপর ও সমকালীন অনেক অনগ্রসর জাতির তথ্য তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় ভাগ : ইবনে খালদুন তার 'আল-মুকাদ্দিমা'র তৃতীয় অংশে রাষ্ট্রের উত্থান, ক্রমবিকাশ, রাষ্ট্রের সংহতি, রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল, রাষ্ট্রের পদবিসমূহ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, রাষ্ট্র শাসনের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ ভাগ : 'আল মুকাদ্দিমা' চতুর্থ অংশে ইবনে খালদুন স্থায়ী সমাজ, নগর ও নগরের বিভিন্ন দিকসমূহ এবং প্রদেশের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে বলেছেন।

পঞ্চম ভাগ : পঞ্চমভাগে ইবনে খালদুন অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানাদিক, জীবিকা উপার্জনের যথাযথ উপায়, বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ, শিল্পায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ ভাগ : ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমা' অংশের সর্বশেষ ভাগে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোচনা করেছেন।

"কিতাবুল ইবার" গ্রন্থটি ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি প্রাচীন কাল থেকে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক ইতিহাস লিখেছেন। কিতাবুল ইবারের কয়েকটি খণ্ডে ইবনে খালদুন তার নিজের জীবনী লিখেছেন তার জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, তার শিক্ষকদের কথা, যেসব বই তিনি পড়েছেন এবং যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি অধিষ্ঠিত থেকেছেন তা তিনি আলোচনা করেছেন।

এ বইয়ের শেষ অধ্যায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত নাম আমীর তৈমুর লংয়ের জীবনী ও কার্যাবলি আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তৈমুর লংয়ের জীবনী লিখেছেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ডি বোয়েরের মতে, "ইবনে খালদুন নতুন দার্শনিক পথ নিয়ে উপস্থিত হন, যা সম্বন্ধে এরিস্টটলেরও কোন ধারণা ছিল না।" আর ঐতিহাসিক মার্গোলিয়থ বলেন যে, ইবনে খালদুন এরিস্টটলের মত আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেননি।

ইবনে খালদুনের ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে ইতিহাস লেখার যে প্রবণতা প্রচলিত ছিল তাকে রাজনৈতিক ইতিহাস বলাই যুক্তিযুক্ত। রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার ধারায় রাজা ইতিহাসের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। তার কৃতিত্ব, অবদান, কার্যাবলি, তার প্রেম, তার রসবোধ প্রভৃতি হয়ে ওঠে ইতিহাসের মূল উপজীব্য।

সাধারণ মানুষের জীবনের ইতিহাস বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অনেকটাই অলিখিত অবস্থায় থেকে যায়। এ অবস্থার ইতিহাস লেখার ধারণা পাল্টে নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন ইবনে খালদুন। তিনি সামাজিক ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেন 'আল মুকাদ্দিমা' নামক গ্রন্থ। এছাড়া তার লেখায় আসে বিবর্তনের ধারা, সে সমাজের মানুষের জীবন, গোত্র, সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার নানাদিক। ইবনে খালদুন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সমাজের, রাষ্ট্রের উত্থান, বিকাশ ও পতনের দিকটি উপস্থাপন করেন।

মানুষের ওপর ভৌগোলিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব

'আল মুকাদ্দিমায়' ইবনে খালদুন বলেন যে, মানুষ ও সমাজের ওপর প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তার মতে, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি হয় এবং এ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই একই স্থানে একাধিক সভ্যতার উৎপত্তি হয়। আবার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কেনো স্থানে কোনো ধরনের সভ্যতার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। তার মতে, প্রকৃতিগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বসতির পার্থক্য হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন যে, বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মানুষের বসতি বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এছাড়া চরমভাবাপন্ন উষ্ণ বা ঠাণ্ডা অঞ্চলে মানুষের বসতি কম, কারণ এসব অঞ্চলের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়। তিনি বলেন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মানুষ বেশি বাস করে থাকে এবং আবহাওয়ার কারণে এসব অঞ্চলের মানুষ অধিক মানবিক, অধিক বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, অধিক সংযমী ও সংস্কৃতিবান হয়। আর এসব অঞ্চলের জনগণ চমৎকার সভ্যতার জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে তিনি গ্রিক, রোমান, পারসিক ও আরবজাতিগণ যারা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে তারা মানব সমাজে অবদান রাখতে পেরেছে এ কথা বলেছেন। পরবর্তীতে আমরা দেখি ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য জাতি যারা শীতপ্রধান দেশে বাস করেন তারা সভ্যতায় অবদান রেখেছে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা সভ্যতা সংস্কৃতিতে কোন অবদান রাখতে পারেনি।

সভ্যতার বিকাশে জনসংখ্যা

ইবনে খালদুন বলেন যে, অনেক জনসংখ্যার শক্তিতে এক পর্যায়ে সভ্যতা গড়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল মানুষরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখতে পারে। সমাজ জীবন অনেক আধুনিক হয়। এ পথ ধরে বিকাশ ঘটে সভ্যতার। তিনি সভ্যতাকে 'উমরান' বলেছেন। এর অর্থ গড়ে তোলা, সম্প্রসারণ করা এবং উন্নত করা। বেশি জনসংখ্যার কারণে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এসব চাহিদা পূরণের জন্য অধিক শ্রম দিতে হয়। এর ফলে নগরের সম্প্রসারণ ঘটে।

নগরায়নের ধারণা

ইবনে খালদুন নগরায়নের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুক্ত করেছেন। তার মতে, অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে এক অঞ্চলের মানুষ নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে আরেক অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাতে পারে। এভাবে একে সাথে অন্যের যোগাযোগের মাধ্যমে একটি বিশ্ব সমাজের সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার গতিশীলতার মাধ্যমে জীবনযাত্রার জটিলতা দেখা দেয়। ফলে গ্রামীণ কাঠামো ভেঙে শুরু হয় নগরায়ন। তার মতে, নাগরিক জীবন ব্যবস্থা অনেক জটিল। এ জীবন ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দ উভয়ই আছে। সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানুষ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে।

খাদ্যাভাসে প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাব

ইবনে খালদুন তার 'আল মুকাদ্দিমায়' বলেন যে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অনেক কৃষিজ শস্য, ফলমূল, মাছ ও মসলা উৎপন্ন হয়। এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। আর মরু অঞ্চলের মানুষরা দুধ, মাংস খায়।

রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মত

রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মত ছিল রাষ্ট্র শাসন হবে রাজতান্ত্রিক। খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নানামতের অবসান, রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি এবং রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র শাসনের ক্ষমতা অনেকজনের কাছে থাকলে শাসনকার্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে। একজনের কাছে থাকলে কঠোর হাতে সব অনাচার-

www.pathagar.com

অবিচার দমন করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভল্টেয়ারও (১৬৯৭ – ১৭৭৮ খ্রি.) ইবনে খালদুনের মত গ্রহণ করে বলেন, "সহস্র ইঁদুর দ্বারা শাসিত না হয়ে একটি সিংহের শাসন অধিক শ্রেয়।" ইবনে খালদুন রাজতান্ত্রিক বা একহস্তকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শন

ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো মানব-সমাজ, সভ্যতার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত। আদিম সমাজ থেকে মানুষ কিভাবে অগ্রসর হয়ে বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইবনে খালদুন দিয়েছেন। ইবনে খালদুনের মতে, ইতিহাস নিরস ঘটনাপুঞ্জি নয়, এছাড়া রাজা বাদশা যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও বিভিন্ন বংশের উত্থান-পতনের কাহিনী নয় বরং ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ মানব সভ্যতার অগ্রগতির ঘটনাবলির মাধ্যমে ফুটে উঠে। তার মতে, কোন ব্যক্তি, জাতির চরিত্র, মেজাজ, রুচি ও কৃষ্টির উপর আবহাওয়ার প্রভাব পড়ে। তিনি যে থিউরি বা তত্ত্ব দিয়েছেন তা হলো : সাইবেরিয়া অথবা ল্যাগল্যান্ডের মত শীত প্রধান দেশে বা গ্রীষ্মকালীন দেশে মানুষ শিক্ষা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। তার মতে, রোমান, গ্রিক, পারসিক ও আরব জাতিরা যারা নাতিশীতোষ্ণ দেশে বসবাস করে তারাই মানব সভ্যতায় অবদান দিতে পেরেছে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি, রবার্ট ফ্লিন্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সর্বাপেক্ষা চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস দর্শনের প্রণেতা এবং প্লেটো, এরিস্টটল বা অগাষ্টিন কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

আসাবিয়া

ইবনে খালদুনের মতে, রাষ্ট্র গঠনের মূলেই হলো আসাবিয়া অর্থাৎ গোত্র বা বংশ প্রীতি। কারণ তিনি বলেন যে, আসাবিয়া দুর্বল হয়ে গেলে জাতির অধঃপতন দেখা দেয়। তিনি আরো বলেন যে, ধর্ম আসাবিয়াকে শক্তিশালী করে। রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ আসাবিয়ার কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য আসাবিয়ার কোন বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন রাজবংশ যদি পরিপূর্ণ আসাবিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সে রাজবংশ দীর্ঘ ও ধারাবাহিক বংশানুক্রমিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সূচনা করতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, দেশ জাতির সার্বিক উন্নতি, রাজনৈতিক, সামাজিক, উন্নতি, পরিবার ও রাজবংশের সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আসাবিয়া সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

সমাজ বা রাষ্ট্রের উত্থান, বিকাশ ও পতন সম্পর্কে

ইবনে খালদুন সমাজ বা রাষ্ট্রের উত্থান, বিকাশ ও পতন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইবনে খালদুন রাষ্ট্র শাসন ক্ষেত্রে শাসকরা কীভাবে আবর্তিত হয় সে সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য দিয়েছেন। একটি দেশ পরিচালনা করবার জন্য শাসকদের অনেক বড় বড় শহর, নগর ও বন্দরের প্রয়োজন হয়। এরপর যখন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে তখন শাসকরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে যায়। এ বিলাস-ব্যসনে শাসকবর্গের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। এ অবস্থায় শাসকরা তাদের আরাম আয়েশের জন্য জনগণের উপর অধিক হারে করের বোঝা চাপিয়ে দেন। এতে করে জনগণ ক্রমশ শাসকবর্গের উপর ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা আন্দোলনের মাধ্যমে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধ পরিকর হয়। এ সময় শাসকরা জনগণকে দমন করবার জন্য বহিঃশক্তির সাহায্য কামনা করে। এর ফলে জনগণ শাসক বর্গের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ করে। বহিঃশত্রু ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে। এভাবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারটি "চক্রাকারে আবর্তিত" হয়। ইবনে খালদুনের এ তত্ত্বটি সব যুগের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ চক্রাকার অবস্থা বলতে আসলে ইবনে খালদুন একটি-রাজবংশের পতন ও আরেকটি বংশের উত্থানকে বুঝিয়েছেন। একটি রাজবংশের পতনের সাথে সাথে সে রাজ বংশের বা শাসকদের সভ্যতারও পতন ঘটে। তার মতে, একটি বংশের পতনের সাথে সাথে তার পুরো সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতন ঘটে না। কারন বিজয়ী রাজবংশ পরাজিত রাজবংশের অনেক ভাল কাজ গ্রহণ করে। যে কোন রাজবংশের স্থায়িত্বকে ইবনে খালদুন তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না বলেছেন।[২] এক পুরুষকে তিনি ৪০ বছর ধরেছেন। এভাবে তিন পুরুষ দাঁড়ায় ৪০ + ৪০ + ৪০ = ১২০ বছর। অর্থাৎ ইবনে খালদুন বলতে চেয়েছেন যে কোন রাজবংশ ১২০ বছরের বেশি তার গৌরব রাখতে পারে না। এর পর তার পতন আসবেই। ইবনে খালদুন সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "কোন ইউরোপীয় তো নয়ই এমনকী কোন আরব লেখক ও ইতিহাসের এমন দর্শনগত ও সর্বব্যাপক চিত্র তুলে ধরতে পারেননি। সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে ইবনে খালদুনকে ইসলামী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।"[৩]

---

২. *'আল-মুকাদ্দিমা' ইবনে খালদুন (অনু-গোলাম-সামদানী কোরাইশী) প্রথম খণ্ড ঢাকা-২০০৭, পৃ-৩১৮*

৩. *আরব জাতির ইতিহাস ফিলিপ-কে হিট্টি (অনু-জয়ন্ত সিং সেজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেন গুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩ পৃ-৫৫৬-৫৫৭।*

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড
মুসলিম ভারত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইন্দো মুসলিম ইতিহাসচর্চা

চাচ নামা, আল বেরুনী "কিতাবুল হিন্দ" দিল্লির সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন পর্যটক, প্রচলিত কিংবদন্তী, ব্যবসায়িদের কাছ থেকে আমরা ভারতবর্ষের ধন সম্পদের কথা জানতে পারি। বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়িরা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসতো। তাদের কাছ থেকে এদেশের ধন সম্পদের প্রাচুর্যের কথা সবার কাছে ছড়িয়ে যায়। কাজেই এ ধন সম্পদের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারত বর্ষের উপর তাদের লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করে এবং ভারত বর্ষের উপর তাদের আক্রমণ চালায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স) নবুয়ত প্রাপ্ত হন। এর পর থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের মহান বাণী পৌঁছিয়ে দেবার জন্য এ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। খোলাফায়ে রাশেদীনের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) সময়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এক সময়ে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রাথমিকভাবে নৌ অভিযান পরিচালনা করেন। এর পর তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)-এর ধারাবাহিকতার নৌ অভিযান চালান। কিন্তু, উমাইয়া খিলাফত কালে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) ইরাকের উমাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ তার ভ্রাতুস্পুত্র-ও জামাতা ১৭ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে ভারতের বুকে সর্বপ্রথম মুসলিম প্রভুত্বের সূচনা করেন। আর ভারতে প্রাথমিক মুসলিম আমল আর রাজা দাহির ও তার বংশের ইতিহাস আমরা যে সূত্রের মাধ্যমে পাই তা হলো "তথাকথিত "চাচ নামা" নামক গ্রন্থ থেকে। এ গ্রন্থে মুহম্মদ বিন-কাশিমের সিন্ধু অভিযান ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে। এ গ্রন্থের সাহায্যে আমরা রাজা দাহির ও তার বংশের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে পারি। আমরা আরো জানতে পারি সমকালীন ভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে।

www.pathagar.com

চাচ নামা

সিন্ধুর আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর লিখিত একটি প্রাথমিক ও প্রামাণিক উৎস হলো "চাচ নামা" গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সিন্ধুর রাজা দাহিরের পিতা চাচের সিংহাসন লাভ থেকে শুরু করে মুহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যু পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। চাচনামা বলে এ গ্রন্থে কোন শব্দ লিখিত হয়নি। আসলে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে কোন নাম ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিক এ গ্রন্থের নাম "ফতেহ নামা," "চাচনামা," "তারিখ-ই-হিন্দ ওয়া সিন্দ" নামে অভিহিত করেছেন। এ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন স্যার এইচ. এম. ইলিয়ট। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি "HISTORIANS OF SIND"-এর ভলিউমে "চাচ নামা" নাম দিয়ে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[১] তখন থেকেই এ গ্রন্থটির নাম "চাচ নামা" নামে খ্যাতি লাভ করে।

এ গ্রন্থটি ছিল আরবিতে। এ গ্রন্থের লেখকের নাম আজও জানা যায়নি। এ গ্রন্থের ফার্সি অনুবাদ করেন মুহাম্মদ আলী বিন হামিদ বিন আবু বকর কুফী। তিনি দিল্লির সুলতান নাসির উদ-দীন কুবাচার সময়ে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটি আরবি থেকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদক তার ভূমিকায় বলেন যে, তিনি প্রচণ্ড আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে জীবিকার সন্ধানে নিজ মাতৃভূমি কুফা ত্যাগ করে ভারতের উচ প্রদেশে আসেন। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে ৫৮ বছর বয়সে সুখ্যাতির আশায় তিনি মুহম্মদ বিন-কাশিমের ভারত বিজয়ের তথ্যসংগ্রহ করে গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন। এতে করে তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা আশা করেন এবং নিজেকে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই তিনি উচ ত্যাগ করে আলোর ও ভাকারে যান। এ যায়গায় তিনি আরব বংশোদ্ভুত ইমামদের সাক্ষাৎ পান। এ যায়গায় তিনি মাওলানা কাজী ইসমাঈল বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুসা বিন তাই বিন ইয়াকুব বিন তাই বিন মুসা বিন মুহম্মদ বিন সায়বান বিন উসমান সাকাফির সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তার কাছ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে জানতে পারেন। কাজী ইসমাঈল তাকে জানান যে, তিনি সিন্ধু বিজয়ী মুহম্মদ-বিন-কাশিমের সময়ের যে কাজী ছিল তারই বংশধর। তার পূর্ব পুরুষ আরবি ভাষায় আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিল যা বংশ পরম্পরা তার কাছে আছে। এ গ্রন্থ আরবি ভাষায় হবার কারণে এ দেশের

---

১. *"ফতেহ নামা-মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান (অনু-মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ)" ঢাকা-২০১০।*

www.pathagar.com

জনগণের কাছে আজও অজানা থেকে গিয়েছে। যদি গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনুদিত হয় তাহলে এ দেশের জনগণের অনেক উপকারে আসবে। তিনি এ গ্রন্থটি পড়েন এবং এত বেশি চমৎকৃত হন যে তিনি গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ না করে ভাষান্তরিত করেন এবং নাসির-উদ-দীন কুবাচার মন্ত্রী আইনুল মূলকের নামে উৎসর্গ করেন। অনুবাদক মুহম্মদ আলী মূল আরবি বইয়ে আলাদা আলাদা বিবরণে আলাদা আলাদা উপ-শিরোনাম রয়েছে। কিন্তু, তিনি অনেক শিরোনাম অনুবাদ করেননি। শুধু শিরোনাম লিখেছেন। এ গ্রন্থের রচনা কাল প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ. কে. ইয়াকুব আলী মনে করেন যে, ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[২] তবে আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার মুহম্মদ বিন-কাশিমের সিন্ধু অভিযানের সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব সম্ভবত সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন কাল্পনিক গল্প পরিবেশন করে তার গ্রন্থ রচনা করেন।

"চাচ নামা" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

চাচ নামা আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাথমিক উৎস। রাজা দাহিরের পিতা চাচ একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ থেকে কিভাবে ক্ষমতা দখল করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তা এ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সে সময়ের সিন্ধুর ভৌগোলিক, প্রাচীন স্থান, নদ-নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরো আলোচনা করা হয়েছে– মুহম্মদ-বিন-কাশিম কর্তৃক আরবদের সিন্ধু বিজয়, তাদের শৌর্যবীর্য, মুসলমানদের উদারতা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হিন্দুদেরকে রেখে মুসলমানদের উদারতা, ভারতের সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

সিলাইজের পুত্র চাচ এবং চাচের পুত্র রাই দাহিরের ইতিহাস ও মুহাম্মদ কাসিম সাফিকীর হাতে তার মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে এ গ্রন্থ শুরু হয়েছে। হিন্দ ও সিন্দু-এর রাজধানী ছিল আলোর। যা ছিল কিনা এক বিশাল নগরী, যা সব ধরনের প্রাসাদ ও বাগানবাড়ি, বাগান ও কুঞ্জবন, জলাধার ও নদী, ঘাস ও ফুল দ্বারা সুশোভিত ছিল।[৩] এ

---

২. *"মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা [খিলাফত ও ভারত উপমহাদেশ]" ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ ঢাকা-২০০৮ পৃ-১৪৩।*

৩. *"ফতেহনামা মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান" (অনু মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ) প্রাগুক্ত পৃ-১৫।*

www.pathagar.com

নগরীর রাজা ছিলেন সিহারাস। তার ছিল বিশাল ধন-সম্পদ। তিনি ছিলেন ন্যায়-পরায়ণ ও উদার প্রকৃতির শাসক। তার রাজ্যের সীমানা পূর্ব দিকে কাশ্মীর, পশ্চিম দিকে মাকরান, দক্ষিণ দিকে মহাসাগরের উপকূল ও দেবল এবং উত্তরে-মাকরান ও কাইকানান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তার রাজ্যে ৪ জন শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও ধর্মীয় উপাসনাগুলোর সংস্কার সাধনের নির্দেশ দেন। তার রাজ্যে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু, নিমরোজের রাজার সেনাবাহিনী ফারিস থেকে মাকরানে উপস্থিত হয়।

সিহারাজ এ খবর শুনে আলোর থেকে সৈন্যবাহিনী পিছনে রেখে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সিহারাজ নিহত হন। ফারিস রাজা নিমরোজে প্রত্যাবর্তন করলে সিহারাজের পুত্র রায় সাহাসি সিংহাসনে বসেন। তিনি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। রাম নামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তার প্রধান সচিব ছিলেন। ঠিক এ সময় সিলাইজের পুত্র চাচ প্রধান সচিব রামের কাছে আসেন এবং রাম তার দায়িত্ব চাচের কাছে ছেড়ে দেন। রায় সাহাসির মৃত্যুর পর চাচ ক্ষমতা দখল করেন। চাচ রায় সাহাসির বিধবা পত্নী রাণী সোবহান দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি তার ভাই চান্দারকে তার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে আলোরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। চাচ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘ ৪০ বছর রাজত্ব করবার পর চাচ মৃত্যুবরণ করেন। চাচের মৃত্যুর পর তার ভাই রাজা চান্দার আলোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাদ ধর্মমত পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি তরবারির সাহায্যে হিন্দুদেরকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। ৭ বছর রাজত্ব করবার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর চাচের পুত্র দাহির আলোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর জ্যোতিষির ভবিষ্যৎবাণী করে যে, বাঈকে (রাজা দাহিরের বোন) যে বিয়ে করবে সে হিন্দ ও সিন্দের রাজা হবেন। তাই রাজা দাহির নিজের আপন বোনকে বিয়ে করেন। এরপর ২৭টি শিরোনাম আছে কিন্তু তার কোন অনুবাদ ফার্সি অনুবাদক করেননি। হয়তো তিনি এর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এর অধ্যায়গুলোর মধ্যে একটি খুবই গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল মুহম্মদ-বিন-কাশিমের জীবনী। শুধু শিরোনামের মাধ্যমে আমরা মুহম্মদ বিন-কাশিমের পুরো নাম ইমাম-উদ-দীন মুহম্মদ কাশিম বিন আবি আকিল সাকিফী জানতে পারি। এর পর দেবল জয়ের পর নিরুনের দিকে মুহম্মদ কাশিমের অগ্রযাত্রা দিয়ে তার ফার্সি অনুবাদ শুরু

www.pathagar.com

করেছেন। রাজা দাহিরের সাথে মুহম্মদ বিন-কাশিমের মধ্যে যুদ্ধ ও আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সিন্ধু এক এক অঞ্চল আরবদের দখলে আসতে থাকে। এরপর আছে রাজা দাহিরের পরাজয় ও হত্যার কথা। রাজা দাহির ৯৩ হিজরির ১০ রমজান, বৃহস্পতিবার (৭১২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে) সন্ধ্যার দিকে নিহত হন। যখন রাজা দাহিরের সাথে আরবদের যুদ্ধ চলছিল তখন মহিলারা চিৎকার বলে বলছিল যে, আরব বাহিনী তাদেরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তখন রাজা দাহির তার হাতির মাহুতকে নির্দেশ দেন যে মহিলাদের কাছে তাকে নিয়ে যেতো। ঠিক তখনই মুসলিম সৈন্য বাহিনী রাজা দাহিরের বহনকারী হাতিকে ঘিরে ফেলে। একজন সৈন্য অগ্নিবান (তীরে লাগানো আগুন) নিক্ষেপ করে রাজা দাহিরের হাতির গায়ে। এতে আগুনের লেলিহান শিখায় হাতি পাগলের মতো নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন দক্ষ তীরন্দাজ রাজা দাহিরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তা তার বুকে গিয়ে আঘাত করে। হাতিটি পানি থেকে মাটিতে উঠে আসলে আরব সৈনিকদের একজন তরবারির এক কোপে রাজা দাহিরের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। রাজা দাহিরের মাথা রেখে তার শরীর সেই নদীর কিনারে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখে। এরপর পুরো সিন্ধু বিজয় সম্পন্ন করে মুহম্মদ বিন-কাসিম হাজ্জাজের কাছে রাজা দাহিরের মাথাসহ পত্র পাঠান। হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ যুদ্ধ বন্দি সহ রাজা দাহিরের মাথা খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। বন্দিদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০ হাজার। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কন্যা, রাজা দাহিরের বোনের (বাঈএর) এক কন্যা। দাহিরের এ কন্যার নাম ছিল জয়সিয়া। খলিফা বন্দি কন্যাদেরকে কারো কাছে বিক্রি করে দেন এবং কাউকে কাউকে পুরুস্কার স্বরূপ বিলিয়ে দেন। রাজা দাহিরের বোনের গর্ভজাত কন্যার প্রতি খলিফার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে এবং তার সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ হন যে তিনি নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস মেয়েটিকে পাবার ইচ্ছার কথা খলিফাকে বললে খলিফা তাকে দিয়ে দেন। দীর্ঘ দিন এ মেয়ে আব্বাসের কাছে থাকে কিন্তু তার গর্ভে কোন সন্তান না হবার কারণে আব্বাস এ মেয়েকে খলিফার কাছে দিয়ে যায়। এরপর মুহম্মদ বিন-কাসিম কি ভাবে সিন্ধু অঞ্চলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তার বিবরণ আছে। তিনি সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ নির্মাণ করেন। শাসনকার্যে স্থানীয় হিন্দুদের স্ব-পদে বহাল রাখেন। রাজা দাহিরের স্ত্রী লাডীকে মুহম্মদ বিন-কাশিম বিয়ে করেন। এরপর মুহম্মদ বিন-

www.pathagar.com

কাশিমের করুন মৃত্যু সম্পর্কে ঘটনা এ বইয়ে বর্ণনা করা আছে। যুদ্ধ বন্দি হিসেবে রাজা দাহিরের দুই মেয়েকে বিন-কাশিম খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা রাতে তার মনোরঞ্জণের জন্য রাজা দাহিরের মেয়েদের আহব্বান করে। প্রথমে রাজা দাহিরের বড় মেয়ে সুরিয়া (সূর্য) দেবী এবং পরে ছোট মেয়ে পরিমল দেবী খলিফাকে জানান যে, খলিফা তাদেরকে উপভোগ করতে চান ভাল কথা কিন্তু মুহম্মদ-বিন-কাশিম তিন দিন ধরে আমাদেরকে উপভোগ করে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। ন্যায় বিচারক খলিফা কি ব্যবহার হওয়া মেয়েকে ব্যবহার করতে বেশি আরাম পাবেন।

এ কথা শুনে খলিফা মুহম্মদ-বিন-কাশিমের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষীপ্ত হন এবং তাকে পশুর চামড়ায় শেলাই করে রাজধানীতে পাঠাবার জন্য এক চরম পত্র দেন। মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে চামড়ায় মুড়িয়ে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার মৃত দেহ রাজা দাহিরের কন্যাদ্বয়কে দেখানো হয়।

মুহম্মদ বিন-কাশিমের মৃতদেহ দেখে রাজা দাহিরের দুই মেয়ে বলে ওঠে যে, তারা তাদের পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মুহম্মদ বিন-কাশিমের নামে এমন মিথ্যা কথা বলেছেন। একথা শুনার পর খলিফা বড় আফসোস করছিলেন এবং দুই বোনকে ইটের দুই দেয়ালের মাঝে বন্দি করার (দম বন্ধ করে মারার জন্য) নির্দেশ দেন।[৪]

সমালোচনা

আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে জানতে গেলে এ গ্রন্থের গুরুত্ব হলো অপরিসীম। কিন্তু, এ গ্রন্থ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. এ গ্রন্থে মুহম্মদ বিন-কাশিমের মৃত্যু সম্পর্কে যে কাহিনী আছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। মুহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যুর পিছনে অন্য কারণ ছিল। আর তা হলো উমাইয়া খলিফা সোলায়মানের হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ও তার পরিবার বর্গের প্রতি চরম আক্রোশ। যা এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়নি।

২. এ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের সময়ে সিন্ধু বিজিত হয়। তাও সত্য নয়। সিন্ধু বিজিত হয় খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র আল-ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫খ্রি.) সময়ে।

---

৪. *"ফতেহনামা" পূর্বক্ত।*

www.pathagar.com

৩. এ গ্রন্থে উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের কথা বলা হয়েছে। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ ছিলনা। রাজধাণী ছিল দামেস্কে।

৪. এ গ্রন্থে গল্প বা উপন্যাসের ছলে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– রাজা দাহিরের পুত্র জয়সিংহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্যে ৭০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কিয়াজ বা কোরাস দুর্গে আসেন।

এ দুর্গের অধিপতি দারুহার তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান। প্রথা অনুযায়ী দারুহার সপ্তাহে এক দিনে সুরাপান ও নাচ গানের আয়োজন করতেন। এ উৎসবে জয়সিংহকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি জানান যে তিনি একজন সাধু ও নিজ স্ত্রী ছাড়া কোন অপরিচিত নারীর মুখ দর্শন করেন না। মহিলারা জয়সিংহের দর্শনে মুগ্ধ হন এবং দারুহার বোন জানকীকে তা জানালে জানকী জয়সিংহের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জয়সিংহকে তার সাথে দৈহিক মিলনের জন্য আহবান জানান। কিন্তু জয়সিংহ সে আহবানে সাড়া না দিলে জানকী প্রচণ্ড ক্ষীপ্ত হয়ে বলে, "জয়সিরা যে আনন্দ, ফুর্তি আমি আশা করেছিলাম তা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ। এখন আমি স্থির করেছি, তোমাকে ধ্বংস করে দেব এবং আমি নিজেকেও আগুনের খোরাকে পরিণত করব।"[৫] জানকী তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে জয় সিংহের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন যে জয়সিংহ তার শ্লীলতাহানী করেছে। এ কথা শুনে দারুহার প্রচণ্ড ক্ষীপ্ত হন এবং তিনি জয়সিংহকে হত্যা করবার জন্য মনস্থীর করেন। অতিথিকে হত্যা করা যায় না বলে দারুহার অন্য পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু, জয়সিংহ দারুহারের সমস্ত ষড়যন্ত্র বিফল করে স্বদেশে ফিরে যান। ঐতিহাসিক ডাউসন বলেন, "পূর্ণ গ্রন্থটির বিবরণে সত্যের বায়ুর ছোঁয়া প্রবাহমান এবং যদিও এটির বিবৃত ঘটনাবলি ইতিহাসের চেয়ে গল্পকাহিনী হিসেবে পাঠ করার আনন্দ আছে তবুও বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করতে এটির ভূমিকাও আছে এবং তা গ্রন্থকারের কল্পনার ফসল থেকে কম উৎসারিত হয়েছে।"

মূল্যায়ন

বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য ছিল অপরিসীম। আরবদের সিন্ধু বিজয়, চাচ বংশের ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থের গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন-

---

৫. ঐ পৃ.-৭৩।

www.pathagar.com

কাশিম কিভাবে সেখানে মুসলিম শাসনকার্য চালায় তাও জানা যায়। আরবরা বল প্রয়োগে সিন্ধুর অধিবাসীদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়নি। বরং তারা সিন্ধুর জনগণকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে দিয়েছে। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস না করে বরং সেগুলো পুনর্নির্মাণে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। জনগণের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে। "চাচ নামা" গ্রন্থ-ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পুনঃগঠনের অন্যতম উৎস। অষ্টম শতাব্দিতে সিন্ধুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এ গ্রন্থের মাধ্যমেই জানা যায়। এটি ছিল এক প্রত্যক্ষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চোখে দেখা গ্রন্থ। তিনি খুব সম্ভবত মুহম্মদ বিন-কাশিমের সিন্ধু অভিযানের সময়ে এখানে উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত ঘটনা দেখেছেন, ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বক্তব্য তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি খুব সম্ভবত শেষ বয়সে তার এ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। যখন চলছিল আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) রাজত্ব কাল। কারণ তিনি ভুল করে উমাইয়া খিলাফতে রাজধানী বাগদাদের কথা বলেছেন।

আল-বেরুনী

পরিচয়

পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুনী ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) তুর্কেমিনিস্তান ও উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের মধ্যবর্তী আমুদরিয়া (Oxus) নদী প্রবাহিত হয়ে আরাল সাগড়ে পড়ার আগে যে বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল বা ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে-তারই উর্বর দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীন খাওয়ারিজম রাজ্যের রাজধানী উরগেঞ্জে (বর্তমান নাম Konya) এক ইরানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উরগেঞ্জ ছিল একটি প্রাচীর বেষ্টিত শহর। শহরের বাইরের লোকজন যারা শহরে আসা-যাওয়া করত তাদেরকে শহরের অধিবাসীরা স্থানীয় খাওয়ারিজমী ভাষায় বলত "আবিজাক" ফার্সিতে "বেরুনী" অর্থাৎ বহিরাগত। এ "আবিজাক" শব্দ থেকে তার নামের সাথে "বেরুনী" শব্দ যুক্ত হয়। এ নামে তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার পুরো নাম হলো আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ আল-বেরুনী। তার বাল্যকাল ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। তিনি একজন জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও তর্কবিদ ছিলেন। তিনি ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণকারী গজনীর সুলতান মাহমুদের অধীনে চাকরি করেন। তিনি সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সময় ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ভারতে দীর্ঘ ৪০ বছর কাটান। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাব-আল-হিন্দ" রচনা করেন।

www.pathagar.com

"কিতাব-আল-হিন্দ" গ্রন্থের বিষয়বস্তু"

আল-বেরুনীর "কিতাব-আল-হিন্দ" গ্রন্থটি মোট ৬০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ গ্রন্থে তিনি দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেন।[৬] তিনি তার এ গ্রন্থটি ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। তিনি ভারতীয় হিন্দুদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ প্রথার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য এ ৪ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজে উচ্চ শ্রেণির। তারা কোন পাপ কাজ করলে তা পাপ কাজ হয় না। "বেদ" ছিল হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। সমাজে নিম্ন বর্ণের কেউ বেদ পড়তে পারতো না। যদি কেউ বেদ পড়ত তাহলে তার জিহ্বা কেটে দেয়া হত। ব্রাহ্মণরা বহু বিবাহ করতে পারতো। হিন্দুদের মধ্যে তালাকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত মেয়েরা পিতার সম্পত্তির কিছু অংশ ভোগ করতে পারতো। আসলে তাদের সম্পত্তির কোন অংশ ভোগ করার অধিকার ছিল না। বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে মেয়েদেরকে স্বামীর চিতার সাথে আগুনে পুড়তে হত। তারা নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো। আবার এ যুগে "দেবদাসী" প্রথা ছিল। ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতার সেবার জন্য মন্দিরে অবিবাহিত নারীদেরকে পুরোহিতদের ভোগের জন্য দেয়া হত। হিন্দুরা বিভিন্ন জাদু-টোনার বিশ্বাস করত। জাতিভেদ প্রথা সমাজে এক চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কোন ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের কেউ নিম্ন বর্ণের ছায়ারও পাশ দিয়ে যেত না। যদি যেত তাহলে তার যাত চলে যেত। আল বেরুনী হিন্দুদের মামলা-মোকদ্দমা বিচার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের হিন্দুদের বিজ্ঞান চর্চার কথাও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর আকার কেমন ছিল হিন্দুদের ধারণার কথা তিনি বলেছেন। তিনি চন্দ্র, সূর্য গ্রহণ, জোয়ার-ভাটার কথা বলেছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন নদ-নদী, তাদের উৎস পথ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ, সংখ্যা, চিহ্ন, নগর-শহর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উৎসব পার্বনের কথাও বলেছেন। তিনি পরকাল সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণার কথাও বলেছেন। তিনি তার রচনায় এরিস্টটলের কথাও বলেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে। বস্তুত আল-বেরুনী তার ভারতে দীর্ঘ অবস্থানের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়েছেন। তার আলোচনা থেকে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি।

---

৬. *"আল-বেরুনীর ভারতত্ত্ব" আল-বেরুনী (অনু. ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ) ঢাকা-২০০৪।*

www.pathagar.com

আল-বেরুনী ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নামাজের সময় নির্ধারণের জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেন। কিন্তু গজনীর জামে মসজিদের ইমাম এ যন্ত্রকে না জায়েজ বা হারাম বলে ফতোয়া দেয় এ কারণে যে তা গ্রিক বর্ষ-অনুসারে তৈরি করা হয়েছিল। এতে করে আল-বেরুনী ইমাম সাহেবের উপর প্রচণ্ড ক্ষীপ্ত হয়ে বলেন যে, মুসলমানদের জন্য খাওয়া ও ভ্রমণ করাও হারাম। কারণ গ্রিকরা খাবার খায় ও ভ্রমণ করে।

আল-বেরুনী গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন, এবং অনেক গ্রিক গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তার রচিত গ্রন্থ তিনি সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের নাম ছিল 'কানুন আল-মাসউদী ফী আল-হায়াহ-ওয়া আল-নজমু।" এতে খুশি হয়ে সুলতান মাসুদ তাকে এক হাতী বোঝাই রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। কিন্তু, তিনি তা না নিয়ে বরং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেন। এতে তিনি তার উদার মন-মানসিকতার পরিচয় দেন।

দিল্লির সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য

সপ্তম শতাব্দীতে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। মোহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতুব উদ-দীন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সূচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের মুসলিম আধিপত্যের সূচনা করেন। ভারতে মুসলিম রাজত্বের সূচনার সাথে সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসচর্চায় এক নব জীবনের সূচনা হয়। কারণ মুসলিমরা ইতিহাসচর্চাকে তাদের ধর্মের পড়েই স্থান দিত। দিনপঞ্জী লিখে রেখে এবং বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রাকৃতিক, পরিবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংস্কৃতিক দিক লিখে মুসলিমরা ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। কারণ হিন্দুরা তাদের জীবনের ইতিহাস লিখে যায়নি। তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা আজও আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডডওয়েল বলেন, "মুসলিম আমল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লেখা শুরু হয়। ফলে মুসলিম আমলের যেমন জীবন চিত্র পাওয়া যায় হিন্দু আমলে তেমনই ছায়াচ্ছন্ন।"

ভারতে মুসলিম ইতিহাসচর্চার স্তর

ভারতে মুসলিম ইতিহাসচর্চার স্তরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন–

(ক) প্রথম স্তর– ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

(খ) দ্বিতীয় স্তর– ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

(গ) তৃতীয় স্তর– ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

প্রথম স্তরে– ৭১২ – ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অনেক আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছে। এ যুগে 'চাচ নামা" সুলতান মাহমুদের ১৭ বার অভিযানকালে তার সাথে আগত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুনীর লেখা "কিতাব-আল-হিন্দ" আমাদেরকে সে সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

দ্বিতীয় স্তর– ১২০৬ – ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল দিল্লির সুলতানী আমল। এ সময়ে ভারতে প্রচুর ইতিহাসচর্চা হয়। এ সময় ছিল ভারতের সমগ্র অঞ্চল মুসলমানদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ। এ সময়ে প্রখ্যাত সব ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব ঘটে। যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাস আলোর মুখ দেখান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিনহাজ-ই-সিরাজ, শামস-ই-সিরাজ আফিফ, জিয়া-উদ-দীন বারুনী, আমীর খসরু প্রমুখ।

তৃতীয় স্তর– ১৫২৬ – ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় ছিল মুঘল আমল।

এ সময় যারা ইতিহাসচর্চা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, মুঘল সম্রাট বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম, মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের প্রধান পানি বাহক জওহর আফতাবচী, মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারের প্রখ্যাত পণ্ডিত আবুল ফযল আল্লামী, আব্বাস শেরওয়ানী। বস্তুত ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের শেষ হওয়া সময় পর্যন্ত ছিল ভারতে মুঘল যুগ।

সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য

নিম্নে সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. ফারসি ভাষায় ইতিহাসচর্চা

মদিনায় ইতিহাসচর্চা কেন্দ্রে ইতিহাসচর্চা হত আরবি ভাষায়। পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে আমরা দেখি আরবি ভাষায় ইতিহাস লেখা হত। সপ্তম শতাব্দীতে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ে ঘটনাবলি নিয়ে লেখা "চাচনামা" বা দশম শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সময় তার সাথে ভারতের আসা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আল-বেরুনীর "কিতাব-আল-হিন্দ "লেখা ছিল আরবি। কিন্তু, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরবির পরিবর্তে ফার্সি ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়। তাই ভারতে সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ফার্সি ভাষায় ইতিহাস রচনা।

www.pathagar.com

২. রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে প্রাধান্য প্রদান

দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে প্রাধান্য দেয়া। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দরবারি ঐতিহাসিকরা লিখে রাখতেন।

৩. সুলতানদের রাজত্বকাল

সুলতানদের রাজত্বকাল ধারাবাহিকভাবে লেখা দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। "তবকাত-ই-নাসিরী", "তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী", "তাজ-উল-মাসির" প্রভৃতি গ্রন্থে দিল্লির সুলতানদের ধারাবাহিক রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদান

দিল্লির সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সুলতানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র দৃঢ়করণ সম্পর্কে বিবরণ প্রদান। দিল্লির সুলতানরা যখন যেখানে যার বিরুদ্ধে তাদের অভিযান পরিচালনা করতেন তখন তাদের সাথে দরবারি ঐতিহাসিকরা উপস্থিত থাকতেন। তারা সেসব অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে রাখবেন। এখানে ঐতিহাসিকরা সুলতানদের বীরত্ব প্রকাশ করতেন। যেমন– মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা "তবকাত-ই-নাসিরী শামস-উদ-দীন আফিফের লেখা "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী", জিয়া-উদ-বারুনীর লেখা "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী" প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখি ঐতিহাসিকরা সুলতানদের বীরত্ব প্রকাশ করতেন অকাতরে। কোন অবস্থাতে তারা সুলতানদের দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না।

৫. সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশংসা

দিল্লির সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশংসা করা। দিল্লির সুলতানরা ইসলামী আইন অনুসারে দেশ শাসন করতেন। তারা ছিলেন ন্যায় বিচারক ও প্রজানুরঞ্জক শাসক। তারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতেন। কোন অবস্থাতেই বিদ্রোহীদের প্রতি নমোনীয় ভাব প্রদর্শন করতেন না। রাজ্য শাসন সম্পর্কে সুলতানদের বিভিন্ন কার্যাবলি তুলে ধরা ছিল দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. সুলতানদের প্রশস্তি ও অতিরঞ্জন

সুলতানদের উপর প্রশস্তি করে ইতিহাস লেখা হত। অনেক সময় তা অতিরঞ্জন করা হত। যেমন– "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী," "তবাকাত-ই-নাসিরীর" কথা আমরা বলতে পারি।

www.pathagar.com

৭. আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা

কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো সুলতানী আমলের ইতিহাস না হয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করেন। যেমন– দিল্লির সৈয়দ বংশের সুলতানদের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে হলে ইয়াহিয়া-শেরহিন্দের লেখা "তারিখ-ই-মুবারকশাহী' অন্যতম উপাদান। অতএব দেখা যায় যে, দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা।

৮. সুলতানদের দৃষ্টি আকর্ষণ

সুলতানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও ছিল দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মিনহাজ-ই-সিরাজের কথা। তিনি দিল্লির সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের (১২৪৬ – ৬৬ খ্রি.) দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম সুলতানের নামের সাথে মিল রেখে দেন "তবকাত-ই-নাসিরী।"

৯. উপদেশ ও নীতিমূলক রচনা

দিল্লি সুলতানী আমলে ইতিহাস রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নীতি ও উপদেশমূলক রচনা। শাসকের বৈশিষ্ট্য কেমন, কিভাবে দেশ শাসন করতে হবে কিভাবে জনগণকে চলতে হবে এ ধরনের রচনা, জিয়া-উদ-দীন বারুনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তারিখ-ই-ফিরজ শাহীতে" তুলে ধরেছেন।

১০. সত্য ঘটনা ও নির্ভুল তথ্য প্রকাশ

সত্য ঘটনা ও নির্ভুল তথ্য প্রকাশ দিল্লি সুলতানী আমলে ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দিল্লির ঐতিহাসিকতার সত্য ঘটনা ও নির্ভুল তথ্য প্রকাশ করতেন না।

১১. কাব্য ও ছন্দ ভিত্তিক

দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চায় আমরা দেখি কাব্য ও ছন্দ ভিত্তিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেয়া। হাসান নিজামির "তাজুল মাসির," আমীর খসরুর "কিরান-উস-সাদাইন" নামক গ্রন্থে আমরা দেখি কাব্যের সাহায্যে পুরো ঘটনাকে তুলে ধরতে। কাজেই এটাও দিল্লির সুলতানী আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

দিল্লির সুলতানী আমলের (১২০৬-১৫২৬ খ্রি.) ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ধরনের। ভারতে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসচর্চা শুরু হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাজা হাসান নিজামী

দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে হাসান নিজামী ছিলেন অন্যতম। তিনি "তাজুল মাসির" গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মোহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও সুলতান ইলতুতমিশের প্রথম ১৭ বছরের ইতিহাস জানতে হলে এ গ্রন্থের গুরুত্ব হলো অপরিসীম। এ গ্রন্থের ৪ ভাগের ৩ ভাগ কাব্য ধর্মী হলেও সমসাময়িক গ্রন্থ হিসেবে এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য হলো অপরিসীম।

পরিচয়

হাসান নিজামী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি তার নাম হাসান নিজামী বলে উল্লেখ করেছেন। হাম্মের (Hammer) হাসান নিজামীকে লাহোরের অধিবাসী বলেছেন। তা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে তিনি খোরাশানের অন্তর্গত নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি দিল্লিতে আসেন এবং দিল্লির সুলতানী আমলের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সংস্পর্শে আসেন। তার অনুরোধে হাসান নিজামী মোহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন।

"তাজুল মাসির" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

"তাজুল মাসির" আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো "বীরত্ব পূর্ণ কর্মের মুকুট।" তিনি এ গ্রন্থটি প্রথমে আরবি ভাষায় রচনা করবার পরিকল্পনা করেন। পরে তিনি তা ফার্সি ভাষায় রচনা করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের রাজত্বকালের ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ (এ বছর ইলতুতমিশ বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে বৈধভাবে সনদ লাভ করেন) সময় পর্যন্ত তিনি তার এ গ্রন্থ রচনা করেন। যে সব বিষয় এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তা হলো ভারত আক্রমণ : আজমির বিজয় (১১৯১ খ্রি.) রাই পিথোরার সন্তানদের কাছে আজমিরের

www.pathagar.com

প্রশাসানক দায়িত্ব অর্পণ, দিল্লি জয় (তারিখ নেই), মিরাট বিজয়, কুতুব উদ-দীনের গজনী পরিদর্শন, কুতুব উদ-দীনের কোল ও বানারাস গমন (১১৯৩ খ্রি.) ও কোল দখল, মইজ-উদ-দীনের ভারতে আগমন। কালিঞ্জর দখল (১২০২-৩ খ্রি.), ইখতিয়ার-উদ-দীন-মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর শাসন, কুতুব-উদ-দীনের দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন, খোখারদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরির অভিযান, মুহম্মদ ঘুরির হত্যা, কুতুব-উদ-দীনের দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ, কুতুব-উদ-দীনের মৃত্যু, শামস-উদ-দীন ইলতুমিশের সিংহাসনে আরোহণ, আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে ইলতুতমিশের সনদ লাভ প্রভৃতি। গ্রন্থে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়াও কিছু সমাজ ও সংস্কৃতির জীবনের ছবি ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতের সমাজ জীবনের অনেক ছবি তার বিবরণে দেখা যায়।

সমালোচনা

হাসান নিজামীর "তাজুল মাসির" সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. এ গ্রন্থে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। হ্যামারের মতে, ১২,০০০ হাজার লাইনের এ গ্রন্থে ৭,০০০ হাজারের কম নয় এমন আরবি ও ফার্সি কবিতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এ গ্রন্থে দিল্লির সুলতানী আমলের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব-উদ-দীন আইবেক সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। শুধু তার সিংহাসন আরোহণ কাল ও মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. কুতুব-উদ-দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আরাম শাহ (১২১০-১১ খ্রি.) দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোন কিছুই আলোচনা করা হয়নি।

৪. এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি খুবই কম আলোচনা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

এত সমালোচনা সত্ত্বেও "তাজুল মাসিরের" ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো অপরিসীম। সমসাময়িক সময়ের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন। এটি ছিল ভারতের ইতিহাসের উপর প্রথম লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ।

www.pathagar.com

ড. এ. বি. এম হবিবুল্লাহ বলেন, "যদিও তা আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গীতে রচিত তবু যতটুকু তথ্যবলি এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তা মোটামুটিভাবে নির্ভুল বলা যেতে পারে।" এ গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, ছন্দযুক্ত ও অলংকৃত। সাধারণত পারশিক "ফতেহনামা" বা "বিজয় কাহিনীতে" মাত্রাধিক্য ছন্দ ও অলংকার দেখা যায়। এ গ্রন্থ পারশিক "ফতেহ নামা" ধাঁচে ভারতের ইতিহাস লেখা হয়। খালেক আহমদ নিজামী বলেন, "আমীর খসরুর রচিত এ দলিলের সাথে তুলনা করলে "তাজুল মাসির একটি বৃহৎ "ফতেহ নামা" হিসেবে বিবেচিত হয়। এ গ্রন্থের অজস্র অলংকার, উপমা ও কাব্যিক অলংকার রীতি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এ সাহিত্যিক অলংকারাদি বাদ দিলে কোনরূপ অর্থ ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না হয়ে গ্রন্থটির কলেবর বর্তমানের চেয়ে এক চতুর্থাংশের কমে এসে দাঁড়াবে।"

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছিল হাসান নিজামীল "তাজুল মাসির"। ভারতের প্রাথমিক যুগের মুসলিম ইতিহাস জানতে হলে এ গ্রন্থের গুরুত্ব হলো অপরিসীম। যদিও কবিতা দিয়ে এ গ্রন্থ ভরা ইতিহাস কম তার পরও এর গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মিনহাজ-ই-সিরাজ

মধ্যযুগের বিশেষ করে সুলতানী আমলের ঐতিহাসিকের মধ্যে মিনহাজ-ই-সিরাজ প্রথম সারির ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি "তবকাত-ই-নাসিরী" রচনা করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে দিল্লির সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের (১২৪৬-৬৬ খ্রি.) রাজত্বকালের ১৬ বছর অর্থাৎ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। মিনহাজ-ই-সিরাজ দিল্লির সুলতানী শাসনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তিনি অনেক ঘটনা নিজে দেখেছেন। আবার তথ্য সংগ্রহের জন্য উচ্চ গোয়ালিয়র, দিল্লি ও বাংলা ভ্রমণ করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার বইয়ে লিখেছেন। তিনি বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের ৪০ বছর পর সর্বপ্রথম বাংলায় আসেন এবং বখতিয়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম তার "তবকাত-ই-নাসিরীতে" তা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দিল্লির সুলতানী আমলের সুলতানদের এবং বাংলার খলজী মালিকদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ঘটনার সন, তারিখ নির্ভুলভাবে দিয়েছেন।

পরিচয়

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৫৮৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

তার পুরো নাম কাযী-উল-কুযযাত সদর-ই-জাহান আবু উমর ওয়া মীনহাজ-উদ-দীন-ওসমান বিন সিরাজ উদ-দীন মোহাম্মদ আফসাহ-উল "আযম" উজবাত-উয-যমান ইবন-ই-মীনহাজ-উদ-দীন আল জোযজানী। তিনি ইতিহাসে "মিনহাজ-ই-সিরাজ" নামে পরিচিত। তার পিতার নাম মাওলানা সিরাজ উদ-দীন মোহাম্মদ। তার প্রপিতামহ মাওলানা আব্দুল খালেক জুরজান থেকে গজনীতে এসে তৎকালীন সুলতান ইব্রাহীমের ৪০ জন কন্যার মধ্যে একজনকে বিবাহ করেন। মিনহাজের মাতাও রাজকীয় পরিবারের ছিলেন। গিয়াস-উদ-দীন মোহাম্মদ বিন সামের কন্যা

---

১. *"তবকাত-ই-নাসিরী" মীনহাজ-ই-সিরাজ (অনু. আ.ক.ম যাকারিয়া) ঢাকা-২০০৭।*

www.pathagar.com

রাজকুমারী মাহি মালিকের দুধবোন ও সহপাঠিনী ছিলেন মিনহাজের মা। মিনহাজ দিল্লির নাসিরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, গোয়ালিয়রের কাজীর পদ এবং সে শহরের মসজিদে ধর্মীয় প্রচারকও ছিলেন। তিনি সরাসরি দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও নিজেকে ইতিহাসচর্চায় নিয়োজিত রাখেন। তিনি মৃত্যুর পর মানুষের কাছে চির অমর হয়ে থাকবেন এ আশায়ও ইতিহাস লিখেন।

"তবকাত" শব্দের অর্থ

"তবকাত" আরবি শব্দ। এটি "তাবকা" শব্দের বহু বচন। "তবকাত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো "স্তরসমূহ"। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে "তবকাত" কোন শ্রেণির বিধিমালা, বংশক্রম ও প্রজন্ম বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় "তবকা" ইরানের রাজকীয় পরিবারের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। কিন্তু পরে আর এভাবে এর প্রয়োগ না হয়ে এর শ্রেণি বিভাগ দাঁড়ায়-কবি, সুফি-সাধক, ধর্মবেত্তা, আইন শাস্ত্রজ্ঞ, চিকিৎসক প্রভৃতি। হাদিস শাস্ত্রে "তবকা" শব্দটি একই প্রজন্মের হাদিসবেত্তাদের জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি একটি "তবকা (স্তর)"-এর সময়ের ব্যবধান ২০ বছর ধরেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তার "তাবকাত-ই-নাসিরী" নামক গ্রন্থে "তবকাত" শব্দটি ব্যবহার করে কোন সময় সীমার মধ্যে রাজবংশ বা মানুষের ইতিহাস আলোচনাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

"তবকাত-ই-নাসিরীর" বিষয়বস্তু

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাত-ই-নাসিরী" ২৩টি তবকাতে বিভক্ত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

প্রথম তবকাত : হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কুলপতি, নবী, রসূল ও হযরত মোহাম্মদ (স)-এর পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তবকাত : এ খণ্ডে ইসলামের প্রথম চার খলিফা, তাদের বংশধরদের এবং মহানবী (স)-এর সহচরদের বিবরণ আছে।

তৃতীয় তবকাত : উমাইয়া খলিফাদের বিবরণ এতে আছে।

চতুর্থ তবকাত : আব্বাসীয় খলিফাদের বিবরণ এতে আছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম তবকাত : এ তবকাতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের অভ্যুদ্বয় পর্যন্ত অনারব মালিকদের ইতিহাস।

ষষ্ঠ তবকাত : এ তবকাতে তুব্বা এবং ইয়ামেনের মালিকদের ইতিহাস আছে।

সপ্তম তবকাত : তাহিরী বংশজাত অনারব মুসলিম মালিকদের ইতিহাস আছে।

অষ্টম তবকাত : এ তবকাতে আছে সুক্করিয়াম বংশের ইতিহাস।

নবম তবকাত : এ তবকাতে আছে সামানি বংশের ইতিহাস।

দশম তবকাত : এ তবকাতে আছে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত দারুল খেলাফতের দারেলিমা বংশের মালিকদের ইতিহাস।

একাদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে সবুক্তগীন গোত্রের ইয়ামিনিরাহ বংশ ও আল মাহমুদিয়া শাসকদের ইতিহাস।

দ্বাদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে সেলজুক বংশের ইতিহাস।

ত্রয়োদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে সানজারিরাহ শাসকদের বর্ণনা।

চতুর্দশ তবকাত : এতে আছে সিজিস্তান ও নিমরোজের মালিকদের কাহিনী।

পঞ্চদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে শামের কুর্দিয়া মালিকদের ইতিহাস।

ষোড়শ তবকাত : এতে খাওয়ারিজম বংশের মালিকদের কাহিনী।

সপ্তদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে শামসাবানি সুলতান ও গৌড়ের মালিকদের কাহিনী।

অষ্টাদশ তবকাত : এ তবকাতে আছে তুর্কিস্থান ও বামিয়ানের শামসাবানি সুলতানদের ইতিহাস।

উনবিংশ তবকাত : এ তবকাতে আছে শামসাবানি বংশের গজনীর সুলতানদের ইতিহাস।

বিংশ তবকাত : এ তবকাতে হিন্দুস্থানের মুইজিয়া সুলতানদের কাহিনীর সাথে সাথে বাংলার খলজী মালিকদের বিশেষ করে বখতিয়ার খলজীর কথা আছে।

একবিংশ তবকাত : এ তবকাতে হিন্দুস্থানের শামসি সুলতানদের কাহিনী আছে।

দ্বাবিংশ তবকাত : এ তবকাতে হিন্দুস্থানের শামসি মালিকদের কথা আছে।

ত্রয়োবিংশ তবকাত : এ তবকাতে ইসলামের বিষয়াবলি ও অবিশ্বাসীদের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে বলা আছে।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় "তবকাত-ই-নাসিরী"

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই নাসিরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ২০, ২১ ও ২২ নং তবকাতে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। মইজ-উদ-দীন মোহাম্মদ ঘুরি ও তার ক্রীতদাসদের কথা দিয়ে মিনহাজ তার লেখা শুরু করেছেন। তার পর দিল্লির সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবেকের কথা এসেছে। কুতুব-উদ-দীনকে মিনহাজ "দ্বিতীয় হাতেম", দয়াবান বলেছেন। মিনহাজ কুতুব-উদ-দীন আইবেকের খুবই প্রশংসা করেছেন। আবার এও বলেছেন কুতুব-উদ-দীন আইবেক লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতেন এবং হত্যাও করতেন লক্ষ লক্ষ।[২] এরপর খুবই সংক্ষিপ্তভাবে কুতুব-উদ-দীন আইবেকের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। কুতুব-উদ-দীন আইবেকের মৃত্যুর পর আরাম শাহের সিংহাসনে আরোহণের কথা বলা হয়েছে। দরবারের অমাত্যরা আরাম শাহকে সিংহাসনে বসায় তাও মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মিনহাজ মোহাম্মদ ঘুরির সাথে পৃথ্বিরাজ চৌহানের ১১৯১ খ্রিস্টাব্দের তরাইনের প্রথম যুদ্ধ থেকে তার তবকাত-ই-নাসিরী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভারতে মুসলিম শাসনের পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদ তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন। মোহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক দাসত্ব থেকে কুতুব-উদ-দীন আইবেকের মুক্তি লাভ তিনি বর্ণনা করেছেন। মিনহাজ সুলতান ইলতুতমিশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার সময়ে প্রভাবশালী ২৫ জন অমাত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুলতান ইলতুত মিশের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞার কথা মিনহাজ বলেছেন। দিল্লির সিংহাসনে একমাত্র নারী সুলতানা রাজিয়া সম্পর্কে মিনহাজ বলেছেন। ইলতুতমিশ তার কন্যা রাজিয়া সম্পর্কে বলেছেন, "আমার পুত্রগণ ভোগ বিলাস ও যৌবনের [প্রমত্ততায়] মগ্ন এবং রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা কারোর নেই। তাঁদের দ্বারা রাজ্য শাসন করা সম্ভবপর হবে না। আমার মৃত্যুর পর আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, রাজ্যের উত্তরাধিকারী তারা কেউ তাঁর [আমার কন্যার] চেয়ে যোগ্যতর হবে না।"[৩] ঐতিহাসিক মিনহাজ দিল্লির সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাঁর এ বিখ্যাত গ্রন্থে রচনা করেছেন।

---

২. *"তবকাত-ই-নাসিরী" মিনহাজ-ই-সিরাজ প্রাগুক্ত।*

৩. *'তবকাত-ই-নাসিরী" পৃ-১১৭।*

www.pathagar.com

মিনহাজ তার তবকাতে বাংলা সম্পর্কে এক মূল্যবান তথ্য লিখে গিয়েছেন। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের ৪০ বছর পর যখন বাংলার খলজী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী (১২১৩-১২২৭ খ্রি.) রাজত্বকালে বাংলায় আসেন বাংলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। বাংলা বিজেতা বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে তিনি সর্বপ্রথম তথ্য প্রদান করেন। ৬৪১ হিজরীতে (১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে) তিনি লখনৌতে শামসাম-উদ-দীনের কাছ থেকে বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে জানতে পারেন। বখতিয়ার খলজীর মোটামুটি একটি পুরো জীবনী তিনি দেন। আজ আমরা বখতিয়ার খলজী সম্পর্কে যা জানতে পারি তা সবই মিনহাজের দেয়া তথ্য। বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজী দিল্লিতে গিয়ে দিল্লির সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সাথে দেখা করেন এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এতে কুতুব-উদ-দীনের কতিপয় আমির বখতিয়ারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হাতির সাথে লড়াই করে তার বীরত্ব প্রকাশ করতে বলে। এতে বখতিয়ার হাতির সাথে লড়াই করেন এবং হাতির নসিকায় এমনভাবে আঘাত করেন যে, হাতি ভয়ে সে জায়গা থেকে পালিয়ে যান। তার পর বখতিয়ার খলজীর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলি তিনি বিস্তারিতভাবে প্রদান করেন। তিনি বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর জনকল্যাণকর অনেক কাজের কথা লেখেন এবং তিনি যে নিজের চোখে তা দেখেন যা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলার সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বাংলার খলজী মালিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথাও বলেছেন। তিনি বাংলার সেন বংশের কথাও বলতে ভুল করেননি। তিনি লক্ষণ সেনকে "একজন মহান ব্যক্তি" বলে অভিহিত করেন। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে বলকা খলজীর বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে বাংলার শাসনভার দিল্লির হাতে চলে যায় তাও বর্ণনা করেছেন। বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে বাংলার ৩০ বছরের ইতিহাস জানতে হলে মিনহাজের "তবকাতের" কোন বিকল্প নেই।

সমালোচনা

ভারত ও বাংলার প্রাথমিক মুসলিম ইতিহাসের উৎস "তবকাত-ই-নাসিরী" সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. মিনহাজের ইতিহাসচর্চা কোন কার্যকারণ ভিত্তিক ছিল না। মূলত তার ইতিহাস গ্রন্থ বংশসমূহের ধারা বিবরণী মাত্র।

www.pathagar.com

২. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ.বি.এম হবিবুল্লাহর মতে, মিনহাজ ঘুরি বংশ, ইলতুতমিশ, উলুঘখান ও নাসির উদ-দীন মাহমুদ প্রমুখ পৃষ্ঠপোষকদের কিছু পক্ষপাতিত্ব করেছেন ও তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করেছেন।

৩. ঐতিহাসিক মিনহাজের গ্রন্থে দিল্লির সালতানাত ঘিরে শুধু রাজনৈতিক সমস্যাবলি এসেছে। কিন্তু সামাজিক ও সংস্কৃতিক অবস্থা তার গ্রন্থে আসেনি।

৪. মিনহাজ কিছু ভুল তথ্যও দেন। যেমন রাজা লক্ষণ সেন সম্পর্কে। রাজা লক্ষণ সেন যখন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার বয়স ৮০ বছর ছিল বলে মিনহাজ উল্লেখ করেন। আসলে তা ঠিক নয়।

মূল্যায়ন

বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাত-ই-নাসিরীর" গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক ফিরিশতা, এলফিলষ্টোন, স্টুয়ার্ট মিনহাজ-ই সিরাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট তার "History of Bengal" নামক গ্রন্থে হুবহুভাবে তবকাতকে ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তবকাত-ই-নাসিরী" লিখে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ভারত ও বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে হলে এর গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
আমীর খসরু

"ভারতের তোতাপাখি" হিসেবে খ্যাত আমীর খসরু ছিলেন মধ্যযুগের ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পি, কবি, সাহিত্যিক ও সাধক। তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি দিল্লির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন (১২৬৬ – ১২৮৭ খ্রি.) থেকে শুরু করে কুতুব-উদ-দীন মোবারক শাহ খলজীর (১৩১৬ – ১৩২০ খ্রি.) পর্যন্ত সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার রচনা লিখেন। তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী।

পরিচয়

১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের পাতিয়ালীতে আমির খসরু জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম হলো খাজা আবুল হাসান ইয়ামিন উদদীন মুহম্মদ হাসান। তিনি ইতিহাসে আমীর খসরু হিসেবে পরিচিত। তার পিতার নাম ছিল আমীর সায়ফুদ্দিন। তার পরিবার মঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। জাতিতে তারা ছিলেন তুর্কি। তার পিতা দিল্লির সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ছোটবেলা থেকেই আমীর খসরুর সঙ্গীতের প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঝোক। তার সুকণ্ঠের জন্য তিনি "Parrot of Hind" বা "ভারতের তোতা পাখি" হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আওলিয়া খাজা মঈন-উদ-দীন চিশতী (রহ)-এর যোগ্য শিষ্য হযরত নিযাম উদ-দীন আউলিয়া (রহ)-এর একজন যোগ্য শিষ্য। তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দিল্লির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের পুত্র মুহম্মদের সহচর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং এখানে থেকে তিনি দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ লাভ করেন। তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন এবং তার কবিতায় তা খুব সুন্দর ছন্দের সাহায্যে তুলে ধরেন। তার কবিতা "মসনবী" ছন্দে লিখিত।

আমীর খসরুর রচনাবলি ও বিষয়বস্তু

আমীর খসরু মোট ৯২ টি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুঃভাগ্য হলেও সত্য যে মাত্র ৭টি ছাড়া আজ আর তার কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির দরবারে অবস্থান করে প্রত্যক্ষ ঘটনাবলির আলোকে তার রচনা লিখেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

www.pathagar.com

১. কিরান-উস-সাদাইন (দুই শুভ নক্ষত্রের মিলন)

আমীর খসরুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো "কিরান-উস-সাদাইন" নামক কাব্য গ্রন্থটি। এটি মধ্যযুগের দিল্লির ও বাংলার ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎসও বটে। ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি রচনা করেন।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু

"কিরান-উস-সাদাইন" অর্থ "দুই তারার মিল"। বাংলার সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুঘরা খান ও তার পুত্র দিল্লির সুলতান কায়কোবাদের মিলনকে কেন্দ্র করে আমীর খসরু এ কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। দিল্লির মহাপ্রতাপশালী শাসক গিয়াস-উদ-দীন বলবনের (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) মৃত্যুর পর তার পুত্র বাংলার শাসনকর্তা বুঘরা খান দিল্লির সিংহাসনে না বসে বাংলাতেই থেকে যান। দিল্লির সিংহাসনে বসেন তার পুত্র ১৮ বছর বয়স্ক কায়কোবাদ। সিংহাসনে আরোহণ করে কায়কোবাদ মন্ত্রী নিযাম-উদ-দীনের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে মদ ও নারী নিয়ে পড়ে থাকেন। ফলে সমগ্র রাজ্যে এক বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুত্রের এ অধঃপতন দেখে পিতা বুঘরা খান পুত্রকে সৎপথে ফিরে আসার জন্য এক পত্র লিখেন। কিন্তু, এতে কোন কাজ না হলে বুঘরা খান সৈন্য বাহিনী নিয়ে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। ওদিকে মন্ত্রি নিযাম-উদ-দীন কায়কোবাদকে কু-পরামর্শ দেয় যে, তোমার পিতা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সৈন্য নিয়ে দিল্লি এসে দিল্লি দখল করে নিবে। কাজেই তাঁকে বাধা দেওয়া এখনই দরকার। তাই পিতাকে বাধা দেবার জন্য স্ব-সৈন্যে কায়কোবাদ রওনা দেন। সরজু নদীর উভয় তীরে বাংলা ও দিল্লির সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করবার জন্য শিবির স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয় এবং তাদের মধ্যে মিলন হয়।

গ্রন্থটির রচনা শৈলী

পিতা ও পুত্রের এ মহামিলনকে কেন্দ্র করে আমীর খসরু তার এ কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। পুরো ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি অপূর্ব ছন্দ, অলংকরণ দ্বারা তার এ অমর কাব্য রচনা করেন। ড. সাকসেনার মতে, সুলতান কায়কোবাদ ও তার পিতা বুঘরা খানের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে রচিত এ মসনবিতে ইতিহাস ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে রাজধানী দিল্লির আড়ম্বর ও সৌন্দর্য সুষমার এক স্বার্থক জীবন্ত চিত্র এ কবিতায় দেয়া হয়েছে। ড. সাকসেনা আরো বলেন, "While composing his Mathnawi the poets imagination was stirred to supreme heights of eloquence" অর্থাৎ "এ গ্রন্থ রচনাকালে কবির কল্পনা অপরূপ বাগ্মিতা ও বাক-চাতুর্যে রমনীয় রূপ লাভ করেছিল।"

www.pathagar.com

২. মিফতাহ আল-ফুতুহ

মসনবী ছন্দে লিখিত "মিফতাহ আল-ফুতুহ" আমীর খসরুর এক দীর্ঘ কাসিদা। এ দিওয়ানে যে সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে খাজা নিযাম-উদ-দীন আউলিয়া (রহ), সুলতান কায়কোবাদ, সুলতান জালাল-উদ-দীন, সুলতান আলা-উদ-দীন এবং অন্যান্য অমাত্য ও রাজকীয় কর্মকর্তা সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক কবিতা। এতে আরো আছে সুলতান জালাল উদ-দীন খলজীর ৪টি বিজয় অভিযান।

৩. আশিকা

১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে আমীর খসরু "দেবল রানী খিজির খান" বা "দুয়াল রানী খিজির খান" নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। সুলতান আলা-উদ-দীন খলজীর পুত্র খিজির খান ও গুজরাটের রাজকন্যা দেবল রানীর প্রেমকাহিনীর উপর নির্ভর করে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। কথিত আছে যে, একদিন খিজির খান দেবল রানীর প্রতি তার গভীর ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করে খসড়াটি আমীর খসরুর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তা কবিতায় রূপান্তরিত করে দিতে বলেন। আমীর খসরু তা কবিতায় রূপান্তরিত করেন। এ গ্রন্থে আমীর খসরু ফুলের বর্ণনার পাশাপাশি নারীদের অপরূপ সৌন্দর্যেরও বর্ণনা দেন।

৪. খাজাইন আল-ফুতুহ বা তারিখ-ই-আলাই

আমীর খসরুর এ গ্রন্থটি একমাত্র গদ্য ভাষায় লেখা। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সুলতান আলা-উদ-দীন খলজীর ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ থেকে শুরু করে ১৩১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেবার বিজয়ের সময় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. নুহ সিফির

"নুহ সিফির" ছিল আমীর খসরুর অন্যতম কাব্য ধর্মী ইতিহাস রচনা। এটা দিল্লির সুলতান কুতুব-উদ-দীন মোবারক শাহের (১৩১৬-১৩২০ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্বকালের ঘটনার বর্ণনা করা আছে। সুলতানের কাছ থেকে পুরস্কার পাবার আশায় তিনি ১৩১৮ খ্রি. এই কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে তিনি ভারতের আবহাওয়া, জলবায়ু, নববর্ষ, ফুল, পাখির অনেক প্রশংসা করেছেন।

৬. তুঘলক নামা

"তুঘলক নামা" কাব্য গ্রন্থটি ছিল আমীর খসরুর শেষ রচনা। এ গ্রন্থে তিনি খসরু খানের উপর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের বিজয় কাহিনী এবং ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে গিয়াস উদ-দীন তুঘলকের দিল্লি দখল করে "তুঘলক বংশ" প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কুতুব-উদ-দীন মোবারক খলজী ও খসরু খানের রাজত্বকালেরও বিবরণ আছে।

www.pathagar.com

সমালোচনা

মধ্যযুগে আমীর খসরুর মতো প্রতিভা ছিল বিরল। কিন্তু, তার পরও তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। যেমন–

১. আমীর খসরু ইতিহাসের ঘটনাবলি বর্ণনা অপেক্ষা কাব্যের প্রতি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. তিনি ইতিহাসের ঘটনার সাথে কল্পনার উপর বেশি জোর দেয়ায় তার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

৩. আমীর খসরু ইতিহাসের কোন উৎস ব্যবহার করেননি।

৪. সুলতান বা তার পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি অতি প্রশংসা বা পক্ষপাতিত্ব ইতিহাসের মৌলিকতা ক্ষুণ্ন করেছে।

৫. কোন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তার লেখায় ছিল না।

৬. আমীর খসরু তার ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলি বর্ণনা করলেও তার ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়নি।

৭. আমীর খসরু ব্যক্তিগত উন্নতি ও তার উদ্দেশ্য পূরণ এবং শিল্প সৌন্দর্যের তাগিদে ইতিহাস রচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক হিসেবে আমীর খসরু

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বার্থক ঐতিহাসিক হিসেবে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তার ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. রাজনৈতিক ঘটনা আশ্রিত ইতিহাস

আমীর খসরুর ইতিহাসচর্চার অন্যতম লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক ঘটনার আশ্রয়। তিনি ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে আশ্রয় করে ইতিহাস লিখেন।

২. উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা

তার ইতিহাসের ঘটনাবলির সংরক্ষণ বা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সমকালীন ইতিহাস পৌঁছিয়ে দেয়া আমীর খসরুর লক্ষ্য ছিল না। নিম্নে তার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

www.pathagar.com

(ক) অনুরোধ রক্ষা করা

সুলতান বা তার পৃষ্ঠপোষকদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য তিনি ইতিহাস রচনা করেন।

(খ) পুরস্কৃত হওয়ার বাসনা

সুলতানদের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে লেখা, তাদের কৃতিত্ব ফলাও ভাবে প্রচার করা তার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল।

(গ) সাহিত্য ক্ষেত্রে যশ ও খ্যাতি লাভের আশা

সাহিত্য ক্ষেত্রে যশ ও খ্যাতি লাভ করা তার ইতিহাসচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

৩. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

আমীর খসরুর ইতিহাসচর্চায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তার মতে, ইতিহাস হচ্ছে মানুষের উপর স্রষ্টার দেয়া দায়িত্ব।

সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে আমীর খসরু

আমীর খসরু কেবল কবি, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংগীত শিল্পী। তার অপূর্ব কণ্ঠের জন্য তিনি 'ভারতের তোতা পাখি" হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি চিশতী তরীকার সুফী ছিলেন বলে এ তরীকার সংগীত (সামা) চর্চা করতেন। তিনি অনেক রাগ সংগীতের স্রষ্টা। তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় ও পারসিক সংগীতের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তার গুরু হযরত নিযাম-উদ-দীন আউলিয়া (রহ) তার সৃষ্টি রাগ সংগীত ইমনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

মৃত্যু

এ মহান পণ্ডিত ব্যক্তি ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি দিল্লির ৮ জন সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পৃথিবীর বিখ্যাত পারস্যের কবি শেখ সাদী তার কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জিয়া-উদ-দীন বারানী

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে জিয়া-উদ-দীন বারানী ছিলেন অন্যতম। তিনি ভারতের মুসলিম সালতানাতের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন একজন চাটুকার ও গোড়াপন্থী ঐতিহাসিক। দরবারি ঐতিহাসিক হিসেবে তার লেখায় কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। তার লেখায় সুলতানের প্রশংসা ও প্রশস্তি দেখা যায়। তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তার 'তারিখ-ই-ফিরজ শাহী' নামক গ্রন্থ রচনা করে।

পরিচয়

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারানী ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দোয়ার অঞ্চলের বারান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বারানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তার নামের সাথে 'বারানী' যোগ করা হয়। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (পিতার দিক থেকে শেখ আর মাতার দিক থেকে তিনি সৈয়দ ছিলেন)। তার নানা হিশাম উদ-দীন ছিলেন দিল্লির সুলতান গিয়াস উদ-দীনের সিপাহশালার।[১]

শিক্ষা জীবন ও প্রাথমিক কর্মজীবন

বারানী তৎকালীন এশিয়ার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লিতে শিক্ষা লাভ করেন। আরবি ও ফার্সী ভাষায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ভারতে খলজী বংশের সুলতান জালাল উদ-দীন খলজীর রাজত্বকালে (১২৯০ – ১২৯৬) তিনি পিতার সাথে দিল্লিতে আসেন। যৌবনে তিনি দিল্লিতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দেখেন। খলজী বংশের পতন হয়ে ভারতে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা পায়। তুঘলক বংশের দ্বিতীয় সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫ – ১৩৫১ খ্রি.) তার ভাগ্য

---

১. *"তারিখ-ই-ফিরজ শাহী" জিয়াউদ্দীন বারানী (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী) ঢাকা-১৯৮২, পৃ.-৩১।*

www.pathagar.com

খুলে যায়। বারানীর প্রতিভার কথা জানতে পেরে সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক তাকে নাজিম হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বছর ধরে মুহম্মদ বিন-তুঘলকের নাজিম বা অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। এ কারণে তিনি মুহম্মদ বিন-তুঘলকের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সামনে থেকে দেখে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হলে বারানীর জীবনে আবার দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি আবার রাজ ঐতিহাসিকদের পদ পান এবং তিনি সম্মানজনক অবস্থায় ফিরে আসেন।

বারানীর ইতিহাস লেখার কারণ

জিয়া-উদ-দীন বারানী ৩টি কারণে ইতিহাস লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। যেমন–

(১) জিয়া-উদ-দীন বারানী বলেন যে, তার মানষিক ইচ্ছাই তাকে ইতিহাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের নাজিম ছিলেন। নাজিম থাকাকালীন সময়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সুলতানের কাজের কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, সুলতানের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ না করে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। কাজেই দেরিতে হলেও তিনি লেখার মাধ্যমে সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। এভাবেই তিনি নিজের শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেন।

(২) সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায়ও বারানী ইতিহাস লিখতে সচেষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, লেখার মাধ্যমে তিনি যদি সত্য প্রকাশ না করেন তাহলে মহান আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিয়ামতের দিন তিনি কোনোভাবেই মুক্তি পাবেন না। এর থেকে বুঝা যায় যে, শুধু পার্থিব সুখ, সুবিধার জন্যই নয় বরং তিনি পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও ইতিহাস লিখতে উদ্বুদ্ধ হন।

(৩) সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর বারানীর জীবনে প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। তিনি নতুন সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার আসায় তার প্রশস্তি গেয়ে ইতিহাস লিখেন। কারণ সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর তার জীবনে যেমন দুঃখ নেমে আসে ঠিক তেমনি এক পর্যায়ে তিনি কারাগারেও আটক থাকেন। তাই তিনি সুলতান ফিরজশাহ তুঘলকের সুনজরে পড়বার আশায় সুলতানের নামের সাথে তার গ্রন্থের নাম 'তারিখ-ই-ফিরজশাহী' রাখেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে তার এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি লেখা শেষ করেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে বারানীর বক্তব্য

বারানীর মতে, একজন ঐতিহাসিককে সৎ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ঐতিহাসিককে ভুল ইতিহাস লেখা যাবে না। ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হবে যে, আখিরাত বা মহাবিচারের দিনে তাদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী থাকতে হবে ও জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে একজন ঐতিহাসিক তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, একজন ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো ইতিহাসের শিক্ষা মানুষকে জানানো।

"তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

"তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" গ্রন্থে বারানী দিল্লির সুলতান বলবন, কায়কোবাদ, জালাল-উদ-দীন খলজী, সুলতান আলা-উদ-দীন খলজী, কুতুব-উদ-দীন মোবারক শাহ, গিয়াস উদ-দীন তুঘলক, মুহম্মদ-বিন-তুঘলক, সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলক এ ৮ জন সুলতানের জীবনী ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বারানী তার বইয়ের ভূমিকায় মহানবী (স) খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এ সাথে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একজন ঐতিহাসিকের কি চরিত্র হওয়া উচিত তাও বলেছেন। তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, হযরত আদম (আ) থেকে তিনি ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তার 'তবকাত-ই-নাসিরীতে" এসব আগে আলোচনা করেছেন বলে তিনি শুধু বর্তমান সময়ের সুলতানদের ইতিহাসই লিখবেন। তিনি তার পরিকল্পনা মত সে কাজ করেন। তিনি দিল্লির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের ইতিহাস দিয়ে তার গ্রন্থ সূচনা করেন। তিনি বলেন যে, বলবন ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের মুক্তিপ্রাপ্ত ৪০ জন তুর্কী গোলামের অনত্যম। [২] বারানী বলেন যে বলবন অত্যন্ত কঠোর হস্তে দেশ শাসন করেন। তার তেজস্বীয়তার কথাও তিনি বলেছেন। আবার বলবনের মুখ দিয়ে তিনি একজন শাসক কিভাবে দেশ শাসন করবে অর্থাৎ দেশ শাসন ব্যাপারে কী নীতি নেয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন।

সিংহাসনে আরোহণের আগে বলবন যে মদ পান করতেন, জুয়া খেলতেন, জুয়ার সব টাকা লুট করতেন তা তিনি বলেছেন। তিনি সুলতান কায়কোবাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার পিতা বাংলার শাসনকর্তা বুঘরা খানের সাথে ভুল বুঝাবুঝির কথা ও সরজ নদীর তীরে পিতা পুত্রের মহামিলনের কথা বলেছেন। এ-ও বলেছেন কায়কোবাদের নষ্টের মূলে ছিল মন্ত্রী নিযাম-উদ-দীনের ষড়যন্ত্র।

---

২. *'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" জিয়াউদ্দিন বারানী (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী) ঢাকা-১৯৮২ প্রাগুক্ত, পৃ-১৯।*

www.pathagar.com

বারানী তৎকালীন দ্রব্য মূল্যের একটি বিবরণ আমাদের কাছে রেখে যান। যার গুরুত্ব হলো অপরিসীম। সে সময়ের দিল্লির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। তিনি সুলতান আলা উদ-দীন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) রাজত্বকাল আলোচনা করবার সময় তার অর্থনৈতিক সংস্কার বা দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। আবার তিনি সুলতান জালাল-উদ-দীন খলজীর (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.) রাজত্বকালে দরবেশ সৈয়দ মাওলার বিদ্রোহ ও তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বারানী বলেন যে, দরবেশ হত্যা না করবার জন্য জ্ঞানীরা সুলতানকে মানা করেন। কিন্তু সুলতান জালাল-উদ-দীন দরবেশকে হত্যা করলে ঠিক সে দিন আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এর পরে জালাল-উদ-দীনের বাদশাহীতে নানা রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দরবেশের হত্যার পর থেকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং দিল্লিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এক চীতলে এক সের শস্য বিক্রি হতে থাকে। ক্ষুধার তাড়নায় হিন্দুরা যমুনার গর্ভে আত্মবিসর্জন করতে আরম্ভ করে। আমীর উমরারা যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য ও সহযোগীতা করতে থাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য।[৩] এক বছর চলে এ দুর্ভিক্ষ। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ও দুর্ভিক্ষের অবসান হয়।

বারানী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) রাজত্বকাল নিয়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলক দুবার বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে ভারতের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ফিরজ শাহ তুঘলকের বাংলায় ব্যর্থ অভিযান সম্পর্কে বারানী সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন। তার মতে, সুলতান যখন লক্ষণাবর্তী আক্রমণ করেন তখন বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ভয় পেয়ে পালিয়ে যান একডালা দুর্গে। একডালা দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাণ্ডুয়ার পার্শ্বেই একডালা নামে একটি দুর্গ আছে। উহার একদিকে নদী ও অন্যদিকে গহীন বন।[৪] দিল্লির বাহিনীর প্রবল আক্রমনে বাংলার সৈন্য বাহিনী একদম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বর্ষাকাল এসে পড়ে এবং মশার তীব্র উপদ্রব দেখা দেয়। ফিরজশাহ মনে মনে অনেক দুঃখ পান যে, এ যুদ্ধ বেশি দিন স্থায়ী হলে অনেক লোকের হতাহত হবে। শুধু শুধু মানুষ মারা যাবে এ ভেবে সুলতান সারারাত আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করতেন। অবশেষে ফজরের নামাযের সময় সুলতানের কান্নাকাটি আল্লাহ কবুল করেন। বাঙালি সৈন্য দল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। সুলতান ফিরজ শাহ বীরের বেশে রাজধানী দিল্লির দিকে রওনা দেন। এ রকম অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য বারানী তার গ্রন্থে দেন।

---

৩. *"তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" জিয়াউদ্দিন বারানী পূর্বক্ত, পৃ-১৭৪।*

৪. *ঐ পৃ-৪৮৪।*

www.pathagar.com

বারুনীর ইতিহাস দর্শন

বারানী শুধু ইতিহাস লিখেন নি, সেই সাথে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর মতে রাজ্য, বাদশাহ উযীর, সরকারী কর্মচারী প্রমুখের জন্য ইতিহাস একটি অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তাঁরা অতীতের ঘটনাবলি ও কার্যসমূহের পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে নিজেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বারুনীর মতে, ইতিহাস আমাদেরকে প্রকৃত ধর্ম ও নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে থাকে। সৎ ব্যক্তিদের জন্য ইতিহাস অপরিহার্য পাঠ্য। এছাড়া ইতিহাস আমাদেরকে নবী, রসুল, খলীফা, সুলতান ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এবং শাসন ও ধর্ম সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় কথা শিখায়। বারানীর মতে, ইতিহাস তার গুরুত্ব হারায়, যদি আমরা নীচ, হীন ও অযোগ্য লোকদের কথা আলোচনা করি। অর্থাৎ একেবারে সাধারণ মানুষের জন্য ইতিহাস নয়।"

বারানীর মতে ইতিহাস পাঠের ৭ প্রকার উপকারিতা

বারানীর মতে, ইতিহাস সাত প্রকার উপকারিতা আমাদের দেয়।

(১) ইতিহাস আমাদেরকে আসমানী কিতাবসমূহ, নবী রসুল ও সুলতানগণের কাহিনীর সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। যারা পৃথিবীতে চোখ খুলে থাকে অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ করতে উন্মুখ, তাদের জন্য ইতিহাস অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করে।

(২) হাদীস শাস্ত্রের যমজ ভাই বলতে পারা যায় ইতিহাসকে, কেননা নবী-রসুল-এর বাণী ও কার্যকলাপের সংগে ইতিহাস আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

(৩) ইতিহাস নানা দৃষ্টান্ত পেশ করে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে।

(৪) অতীতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাস শাসকবর্গকে সংকট কালে পথ দেখায়।

(৫) নবী রসুলদের জীবন কথা, কার্যকলাপ এবং তাঁদের জীবনের দুঃখ-ক্লেশ পাঠক দেখে সংকট কালে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষা দান করে।

(৬) পাঠকদেরকে ইতিহাস সৎ ব্যক্তিদের জীবনের সাফল্য ও অসৎ ব্যক্তিদের জীবনের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। সুলতানরা এর ফলে সৎকর্মে তৎপর ও প্রজাবৎসল হয় এবং অনাচার-অত্যাচার থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।

(৭) ইতিহাস সত্যের একটি মজবুত ভিত্তি, কেননা তা সত্য উদঘাটন করে ও 'মিথ্যা পরিহার করে। হার্ডির মতে, "ইতিহাস সম্পর্কে বারানীর দৃষ্টিভংগী ছিল নীতি ও ধর্মভিত্তিক (Didactic and religious)".

হার্ডির মতে, "বারানীর ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য দুনিয়ায় আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার, ইঙ্গিত, ইশারার রহস্য উদঘাটন করা অর্থাৎ ইতিহাস যেন ঐশীবাণীরই এক প্রকার মাধ্যম।"

www.pathagar.com

বারানীর ধর্মীয় বক্তব্য

বারানী ধর্ম ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছেন। সদাচরণ ও ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ ছাড়া কেউ ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির আশা করতে পারে না। শাসক ও সুলতানের জন্য এটি বেশি প্রযোজ্য। নীতিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত ব্যক্তি সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না। প্রতিটি কাজের জন্য পরকালের বিচারের দিনে মানুষকে এবং শাসকদেরকে আল্লাহর কাজে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তি অথবা পুরস্কার তাঁরা পাবেন। বারানীর ইতিহাস দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো মুসলিম শাসকদের আল্লাহ সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

বারানী 'তারীখ-ই-ফিরুজ শাহী' ও 'ফাতওয়া-ই-জাহানদারী' রচনা করেছেন। পি. হার্ডির মতে তাঁর এই রচনাদ্বয় 'The reverse and the obverse of the same ideological coin.'– "আদর্শিক মুদ্রার ওপিঠ-এপিঠ।" বারানী এই দুটি গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম সুলতানগণকে বিশেষ করে দিল্লির সুলতানগণকে ইসলামের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তবে তারীখ-ই-ফিরুজ শাহী হতে আদর্শ প্রচারের দিক থেকে 'ফাতওয়া-ই-জাহানদারী'র পরিসর আরো বিস্তৃত। ফাতওয়া-ই-জাহানদারীকে বারানী গযনীর সুলতান মাহমুদের কথায় তাঁর পুত্রদের এবং ইসলামের শাসকদের উদ্দেশে পারসিক উপাখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে উপদেশ বাণী তুলে ধরেছেন। আর "তারীখ-ই-ফিরুজ শাহীতে" সেই উপদেশ প্রচারে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন বলবন থেকে ফিরুজ শাহ তুঘলক পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলির বিবরণ দিয়েছেন।

বারানীর রাজনৈতিক বক্তব্য

ঐতিহাসিক বারানী তার রাজনৈতিক দর্শনও প্রচার করেন। তার মতে, মহানবী (স)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের ৪ খলিফাই ছিল ইসলামের নিয়মানুগ ও বৈধ খলিফা। এর পর যারা মুসলমানদের শাসকরূপে আসেন তারা কেউ ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ নন। তাই বারানী এসব অবৈধ শাসকদের ক্ষমতার কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা দেন। যেমন–

(১) নীতি বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে এসব শাসকরা ইসলামকে রক্ষার পাশাপাশি ইসলামের সার্বিক অগ্রগতির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবেন।

(২) সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য এসব অবৈধ শাসকরা সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে ইসলামের আরো অগ্রগতি হয়।

www.pathagar.com

(৩) এসব অবৈধ শাসকরা রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামী আইন চালু করবে। তারা সব ধরনের ধর্ম বিরুদ্ধ কার্যকলাপ দমন করবেন।

(৪) এসব অবৈধ শাসকরা রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করবার জন্য শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিয়োগ দান করবে। কোনোভাবো কোনো হিন্দুকে রাষ্ট্রীয়কার্যে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(৫) এসব অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী শাসকরা ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দিবে। এছাড়া রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামী আইন অনুযায়ী শাস্তি দবে।

বারানী প্রশাসন ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত প্রদান করেন। তার মতে, প্রশাসন শক্তিশালী করবার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী দরকার। রাষ্ট্রের জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি দরকার। রাজস্ব ব্যবস্থা থাকতে হবে সুসংগঠিত। এছাড়া সুলতানকে সতর্ক থাকার জন্য একটি সক্রিয় গোয়েন্দা বিভাগ থাকতে হবে।

বারানীর ইতিহাস দর্শন বাস্তবমুখী ও ধর্মভিত্তিক। সেজন্য কুরআন ও হাদিসের পর তিনি ইতিহাসকে জ্ঞানের তৃতীয় উৎস হিসেবে মনে করেন। আর একজন ঐতিহাসিককে অবশ্যই সৎ, নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ, সদাচারী হতে হবে। তা না হলে ইতিহাস নিছক গল্পরসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে। ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা পাওয়া যাবে না। বারানী মনে করেন যে, ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবে নবী-রসুল, রাজা-বাদশাহ ও সুলতান, ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং সরকারি কর্তাগণের কার্যাবলির বিবরণ। তাঁর মতে, অযোগ্য ও নিম্নস্তরের জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হওয়া ঠিক নয়। এতে করে ইতিহাসের মূল্য ও গুরুত্ব হ্রাস পায়। বারানী ইতিহাসকে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ফেলেছেন। বারানীর ইতিহাসের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি বর্ণনার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তাধারার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। সুফি-সাধক নিযামউদ্‌দীন আওলিয়ার খানকাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এই ইতিহাস রচনার মাধ্যমে বারানীর ইতিহাস দর্শন ও ঐতিহাসিকের গুণাবলি ফুটে ওঠেছে।

সমালোচনা

১. "তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী" গ্রন্থে বারানী সন, তারিখের দিকে নজর দেননি। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের মূল্য অনেকটা হ্রাস পায়।

২. বারানী রাষ্ট্রীয় কর্মে শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিয়োগ দেবার কথা বলেছেন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেন। এর ফলে তিনি নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

৩. ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি বলেন যে, বড় বড় ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান লাভ করবে। তার এ ধারণা মোটেও সত্য নয়। কারণ ছোট, বড় সব মানুষের ঘটনাই ইতিহাসের বিয়বস্তু।

৪. তার মতে, ইতিহাস থেকে শুধু শাসকরাই শিক্ষা লাভ করতে পারে। তার এ ধারণাও সত্য নয়। ইতিহাস থেকে সব দেশ, জাতি, মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৫. তিনি নিজের অনেক কথা অন্যের কথা বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, বলবনের মুখ দিয়ে তিনি তার দর্শন বর্ণনা করেছেন।

৬. তিনি সুলতানদের সুনজরে পড়বার আশায় ইতিহাস লিখেন। সব জায়গায় তিনি সত্য কথা বলেননি।

৭. তিনি ফিরজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালকে সবচেয়ে চাটুকারিতার আশ্রয় নেন। তিনি তার গ্রন্থের নাম ফিরজ শাহের নামের সাথে মিল রেখে নাম দেন "তারিখ-ই-ফিরুজশাহী"। তার বাংলা সম্পর্কে বর্ণনা ছিল ফিরজ শাহের বাংলা অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবার ঘটনা ঢাকবার একটা অপচেষ্টা।

৮. বারানী সুলতান আলা-উদ-দীন খলজীর বিভিন্ন সাফল্য ও গৌরবের জন্য হযরত নিযাম-উদ-দীন আওলিয়া (রহ) দোয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সুলতানের কোন যোগ্যতার ব্যাপারে নিরব থেকেছেন। আবার সুলতানকে "নাস্তিক" বলতে একদম কুণ্ঠিতবোধ করেননি।

৯. বারানী কোন কোন ক্ষেত্রে স্ববিরোধী মত দেন। যেমন– সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সুবিচার ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা যেমন বলেছেন আবার তাকে নমরুদ ও ফিরাউনও বলেছেন। কারণ, বারানী ছিলেন একজন গোড়া পন্থী আর সুলতান ছিলেন প্রগতিশীল।

মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসচর্চায় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী রচিত "তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী" গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার এ বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তার এ গ্রন্থ তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চির অমর করে রেখেছে। তার এ গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারি। তাই বাংলার ইতিহাস বিশেষ করে ইলিয়াস শাহী বংশের ইতিহাস পুনঃগঠনে এ গ্রন্থের গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

শামস-ই-সিরাজ আফীফ

মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে শামস-ই-সিরাজ আফীফ ছিলেন অন্যতম। দিল্লির সালতানাত ইতিহাসচর্চায় তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহাসিক। তিনি ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারানীর ইতিহাসের সাথে নীতিবিদ্যা যুক্ত করে ইতিহাসচর্চায় এক নতুন মাত্রা আনেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী"। এ গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি দিল্লির সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের সময় (১৩৫১ – ১৩৮৮ খ্রি.) দিল্লির দরবারে দরবারী ঐতিহাসিক হিসেবে অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তার এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মানবিক পদ্ধতিতে ঘটনাবলি উপস্থাপন করে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের রচনায় এক নতুন মাত্রা আনেন।

পরিচয়

শামস-ই-সিরাজ আফীফের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তৎকালীন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী" নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন।

"তারিখ-ই-ফিরজ শাহী" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আফীফ তার গ্রন্থে সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১ – ১৩৮৮ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ থেকে শুরু করে তার রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং তার সাথে ১৩৯৮ – ৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লি ধ্বংস পর্যন্ত আরো ১০ বছর যোগ করে প্রায় ৫০ বছরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। আফীফ তার গ্রন্থে একজন সুফীর জীবনী বর্ণনার ধারায় শুরু করেছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ দুটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো ইহলোক আর আরেকটি হলো পরকাল অর্থাৎ পরকালীন জীবন। আল্লাহ্ তার করুণার কথা তার প্রিয় নবী (স)-এর মাধ্যমে মানব জাতির কাছে জানিয়েছেন এবং তাকে দুই জাহানের সুলতান করেছেন। কিন্তু, নবী (স) নিজ ক্ষমতা না দেখিয়ে উলামা, সুফি এবং সৎ ধার্মিক

www.pathagar.com

সুলতানদেরকে দিয়ে গিয়েছেন। দূরদর্শী সুলতানরা দ্বীনের ইমামের উদাহরণ সঠিকভাবে পালন করেন। আফীফ তরীকাপন্থী সুফীদের কাছে বিভিন্ন মাকামাত (আধ্যাত্মিক মর্যাদা বা স্থান) যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে তিনি আদর্শ সুলতানের জন্য ১০টি মাকামাত নির্ধারণ করেছেন। এ ১০টি মাকামাত হলো :

১. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবসমূহের জন্য দোয়া।
২. দানশীলতা ও আল্লাহ্‌র ভয়ে দোষ-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।
৩. আদল ও ফযল, ইনসাফ ও করুণা প্রদর্শন।
৪. মুকাতিলা-নিজের প্রবৃত্তি বা নফস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ইসলামের জন্য জিহাদ।
৫. ইসার ও ইফতিখার মানুষের প্রতি দানশীল হওয়া ও যোগ্য ব্যক্তিকে মর্যাদাদান।
৬. আযমাত ও রব-শক্তি প্রতাপ অর্থাৎ দ্বীনের খাতিরে কাফির ও দুর্ধর্ষকে দমন করার ক্ষমতা।
৭. হুশিয়ারি ও বিদারী, সৎ ব্যক্তিদের পালন কার্যে ক্ষিপ্রতা ও সতর্কতা এবং লোভ-লালসা দমনে তৎপরতা।
৮. ইবরাত-সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনে দক্ষতা।
৯. ঈমান ও নাসরাত, ইসলাম বিরোধীদের উপর বিজয় লাভ ও
১০. কিয়াসাত ও ফিরাসাত সংকটকালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা।

আফীফ তার "তারিখ-ই-ফিরজ শাহী" গ্রন্থে ঘটনাবলি সময় অনুসারে না সাজিয়ে ঘটনার শিরোনাম দিয়ে সাজিয়েছেন। এ গ্রন্থটি তিনি ৫টি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে ফিরোজ শাহ তুঘলকের জন্ম থেকে সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলি আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফিরোজ শাহ কর্তৃক লক্ষণাবর্তীতে দুটি অভিযান এবং জাজনগর ও নগর কোটে একটি করে সামরিক অভিযানের বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে থাট্টায় সামরিক অভিযান প্রেরণ, জাম ও বাবিনিয়া দখল এবং সময় জানিয়ে দেবার জন্য পেটাঘড়ি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ফিরজ শাহ তুঘলক বড় ধরনের সামরিক অভিযান পরিচালনা হতে বিরত থাকার এবং জনগণের মন জয় করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে রাজকুমার ফাতাহ খানের মৃত্যুর পর সুলতান ফিরজ শাহের শোক প্রকাশ, তার সময়ের আমত্য ও মালিকদের মাহাত্ম্য বর্ণনাসহ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে।

আফীফের দৃষ্টিতে ফিরজ শাহ

ঐতিহাসিক আফীফের দৃষ্টিতে সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন মহান, উদার, দানশীল সুলতান। তিনি অন্যান্য সুলতানের মত নিষ্ঠুর ছিলেন না। তার মন

www.pathagar.com

ছিল দয়ার শরীক। তার মতে, ফিরজ শাহ সেকালের ইমাম বা নেতা ছিলেন। তার সময়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফীফ বলেন যে, ফিরজ শাহ্‌র জীবন-চরিত তিনি লিখেছেন ফিরজ শাহ সাধারণ মানুষ নন, বরং আল্লাহ্‌র বন্ধু।

আসলে আফীফ সুলতান ফিরজ-শাহ-তুঘলককে সুফী সাধকদের শিষ্য বা একজন সুফী সুলতান হিসেবে বলতে চেয়েছেন। সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলক মুসাফির ও পর্যটকদের জন্য অনেক সরাইখানা নির্মাণ করে তাও আফীফ বলেছেন। আফীফ এও বলেছেন সুলতান নামাজ ও রোজার সময়সূচি জানিয়ে দেবার জন্য পেটা ঘড়ির প্রবর্তন করেন। আফীফ আরও বলতে চেয়েছেন যে, সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের সুশাসনে সমগ্র রাজ্য শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করতো এবং তিনি আরো বলেন যে, ফিরজ শাহের মৃত্যুর ১০ বছর পর তৈমুর লং দিল্লি আক্রমণ ও ধ্বংস সাধন করলেও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে পারেননি এর প্রধান কারণ ছিল ফিরজ শাহের মতো এমন আদর্শ ও ন্যায় পরায়ণ শাসকের শাসনকার্যের জন্য। তিনি আরো বলেন যে, ফিরজ শাহের সময় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগও ঘটেনি।

সমালোচনা

১. আফীফ ঘটনার পুরো বর্ণনা করেছেন কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি।

২. আফীফ সুলতান ফিরজ শাহের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। তাকে অত্যন্ত উচ্চ চরিত্রের হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

৩. তুঘলক বংশ পতনের জন্য যে ফিরজ শাহ তুঘলকের গৃহীত ব্যবস্থাবলি প্রধান কারণ ছিল তা আফীফ বেমালুম ভুলে গিয়েছেন।

৪. তিনি ফিরজ শাহের কৃপা লাভের আশায় তার নামে তার গ্রন্থ লিখে ফিরজ শাহের অনেক দোষ ত্রুটি গোপন করেছেন।

মূল্যায়ন

বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও আফীফের এ গ্রন্থটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ড. মাহদী হোসেনের মতে, আফীফ বারানীর চেয়ে সহজ, সরল ও অকৃত্রিম ভাষায় তার গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থটিকে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে হিন্দুস্তানের Compendium of life (সমস্ত সমাজ জীবনের পূর্ণ বিবরণী) বলে প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক ডাউসন বলেন যে, আফীফের গ্রন্থটিতে একমাত্র আইন-ই-আকবরী ছাড়া একজন মুসলমান শাসকের রাজত্বকালের এমন নিখুঁত সুন্দর বিবরণ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আফীফ। তিনি অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার এ গ্রন্থের গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইবনে বতুতা

বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক হলেন ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খ্রি.)। তিনি তার বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থ "কিতাব-উল-রেহালা" লিখে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর "রেহালার" এত গুরুত্বের কারণ তা হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারত ও বাংলা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আসেন এবং দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে কাজির পদে নিযুক্ত হন। দিল্লিতে অবস্থান কালে সুলতান, সালতানাত এবং সমকালীন ভারতীয়দের আচার-আচরণ, ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। দিল্লির সালতানাত পুনঃগঠনে তার এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত হলো অন্যতম উৎস। তিনি বাংলায় আসেন। বাংলায় এসে তিনি সিলেটে হযরত শাহ জালাল (রহ)-এর সাথে দেখা করেন এবং তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। বাংলা সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ রেখে যান তা খুব অল্প হলেও তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। তাই ইবনে বতুতার এ ভ্রমণ কাহিনীর গুরুত্ব হলো অপরিসীম।

ইবনে বতুতার পরিচয়

বিশ্ববিখ্যাত আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তানজিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম হলো মুহম্মদ-বিন-আবদুল্লাহ। তার পূর্ব পুরুষরা যাযাবার হলেও সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন। তার পূর্ব-পুরুষরা কাজী ছিলেন। ইবনে বতুতার বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে একজন উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময়ে তিনি ৮ বছর কাজীর পদে ছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তিনি তার বিখ্যাত "রেহালা বা "ভ্রমণকাহিনী" রচনা করেন। খুব সম্ভাবত তিনি ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

"কিতাব-উল-রেহালার" বিষয়বস্তু

ইবনে বতুতা দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে (১৩২৫ – ১৩৫৫ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকা, আরব, এশিয়া মাইনর, ইরাক, পারস্য, কনস্টান্টিনপোল, খাওয়ারিজম, বুখারা, সমরখন্দ, খোরাসান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে তার 'রেহালা" রচনা করেন। ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেন, "হিজরি ৭২৫ সালের ২রা রজব, বৃহস্পতিবার (১৪ই জুন, ১৩২৫ খ্রি.) বাইশ বৎসর বয়সে মক্কার কাবা শরীফে হজ্বব্রত পালন ও মদিনায় রসুলের রওজা মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্যে আমি জন্মভূমি তাঞ্জির ত্যাগ করি।[১] তার ভ্রমণ কাহিনীর এক পর্যায়ে আমরা দেখি তিনি গাজা থেকে ইব্রাহিম শহরে যাবার কথা বলেছেন এবং জিনরা যে মসজিদটি হযরত সোলায়মান (আ)-এর জন্য তৈরি করেছেন তার বর্ণনা দেন। তিনি আরো বলেন যে, মসজিদের ভিতরে ইব্রাহীম (আ), ইসহাক (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর কবর আছে। এছাড়াও তিনি বলখের বিখ্যাত বাদশা ইব্রাহীম-ইবন-আদ-হাম-এর কবরের কথাও বলেছেন। যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর পর তিনি আরো বিভিন্ন দেশের কথা বলেছেন এসব সেখানকার রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে-১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আসেন। তখন দিল্লিতে চলছিল তুঘলক বংশের শাসন এবং দিল্লির সুলতান ছিলেন মুহম্মদ-বিন-তুঘলক। সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং তাকে কাজীর পদে নিয়োগ দেন। তিনি দিল্লির ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হন। তার ভাষায়, "ভারতের প্রধান নগর দিল্লি যেমনি বিশাল, তেমনি ঐশ্চর্যশালী শক্তি ও সৌন্দর্যের চমৎকার সমন্বয়। দিল্লি নগর যেরূপ প্রাচীরে ঘেরা, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। শুধু ভারতের নয়-সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যের বৃহত্তম নগর দিল্লি।[২] ইবনে বতুতার বিবরণীতে মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রথম ২০ বছরের রাজত্বকালের ইতিহাস জানা যায়। নিম্নে ইবনে বতুতার ভ্রমণের আলোকে দিল্লি সালতানাত ও মুহম্মদ বিন-তুঘলক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকাল

ইবনে বতুতা ৮ বছর দিল্লির সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের দরবারে কাজীর পদে ছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জনশ্রুতি শ্রবণ করে তা তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তার বিবরণী থেকে তুঘলক বংশীয় সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ২০ বছরের ইতিহাস (১৩২৫ – ১৩৪৫ খ্রি.) পর্যন্ত জানা যায়।

---

১. *'ইবনে বতুতার সফরনামা" (অনু. মোহাম্মদ নাসির আলী) ঢাকা-২০২ পৃ-১।*
২. *"ইবনে বতুতার নফরনামা" (অনু. মোহাম্মদ নাসির আলী) প্রাগুক্ত; পৃ-১০৬।*

www.pathagar.com

২. মুহম্মদ বিন-তুঘলকে রাজধানী স্থানান্তর

ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর ঘটনা জানা যায়। সুলতান ১৩২৬ – ২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগীরিতে স্থানান্তরিত করেন। তার মতে, সুলতান দিল্লির নাগরিকদের বিরুদ্ধ মনোভাবে বিরক্ত হয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

৩. মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের মুদ্রা সংস্কার ও প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন

ইবনে বতুতার বর্ণনায় সুলতানের মুদ্রা সংস্কার সম্পর্কে জানা যায়। সুলতান দিনার নামে নতুন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। তার মতে, এর ওজন ছিল ২০০ গ্রেন। এ ছাড়া ১৪০ রতির ওজনের একরৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। আবার তার মতে, সুলতান ১৩২৯ –৩০ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

৪. মহম্মদ-বিন-তুলকের ধর্মনীতি

ইবনে বতুতার মতে, সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সুলতান। তিনি সুলতানের একজন সমালোচক হয়েও স্বীকার করেছেন যে, সুলতান ইসলামের আদর্শ পালন করতে সর্বদাই যত্নবান থাকতেন এবং কেউ এই আদর্শচ্যুত হলে তিনি তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন। নবী, পয়গম্বর ও খলিফাদের প্রতি সুলতানের গভীর-শ্রদ্ধা ছিল।

৫. মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের কারাচিল অভিযান

ঐতিহাসিক ফিরিশতাসহ প্রায় সব ঐতিহাসিক বলেছেন যে, সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক চীন অভিযানে বের হন। কিন্তু, ইবনে বতুতাই জোর দিয়ে বলেন যে,সুলতান চীন নয় কারাচিল অভিযানে বের হন। এ অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা তার রেহালায় পাওয়া যায়।

৬. চীনের সাথে সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সম্পর্ক

চীনের সাথে সুলতানের ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাট তোঘান তিমুর হিমালয় অঞ্চলে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করবার পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লির সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করেন। সুলতানও প্রচুর উপঢৌকনসহ ইবনে বতুতাকে দূত হিসেবে চীন সম্রাটের কাছে পাঠান। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে চীনের সাথে দিল্লির সু-সম্পর্কে কথা জানা যায়।

৭. উলেমা ও অভিজাতদের প্রতি সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা

ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ওলেমা ও অভিজাতদের অনেকেই সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সুলতান স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি ছাড়াও নতুন নতুন অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

৮. দিল্লির অধীনতা থেকে বাংলার স্বাধীনতা

ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দিল্লির অধীনতা থেকে বাংলা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফকর-উদ-দীন মোবারক সাহ দিল্লির অধীনতা থেকে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৯. সুলতান ও ইবনে বতুতার মধ্যে বিরোধ

ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে,সুলতানের সাথে কোন ব্যাপারে তার বিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে তিনি বন্দি হন। পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং সুলতান তাকে চীনের দূত হিসেবে পাঠালে তিনি আর ভারতে ফিরে আসেননি।

১০. মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে সুলতানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়। ইবনে বতুতা সুলতানের ঘোর বিরোধী হয়েও সুলতানকে বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, উদার বলেছেন। এর সাথে আবার তাকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির সুলতানও বলেছেন।

১১. নগর ও জনজীবন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা

ইবনে বতুতা দিল্লির নগরী, জনসংখ্যা ও জাঁকজমকের প্রশংসা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ভারতীয়তের আচার-ব্যবহার ও লোকদের রীতিনীতির এক মনোজ্ঞ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সতিদাহ প্রথার কথাও বলেছেন। এক নারীকে মৃত স্বামীর সাথে জীবন্ত আগুনে পুড়ে মারতে দেখেছেন।[৩] আবার ইবনে বতুতা হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথার কথাও বলেছেন। মালাবারের হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে কি রকম বর্ণমূলক আচরণ করত তা তিনি বলেছেন।[৪]

ইবনে বতুতার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ছিল তার বাংলা সম্পর্কে লেখা। তিনি বলেন যে বাংলায় তিনি আসেন সিলেটে হযরত শাহ জালাল (রহ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৫ – ৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফকর-উদ-দীন মোবারক শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আসেন। এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে হযরত শাহ জালাল (রা) সাথে দেখা করা। তিনি এদেশে এসে এদেশ সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ রেখে যান। এদেশ সম্পর্কে যে অল্প বিবরণ তিনি লিখে গিয়েছেন তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ সমসাময়িক অন্যকোন সূত্রে এই ধরনের তথ্যের অভাব ইবনে বতুতার সংক্ষিপ্ত এই বিবরণকে আরো বেশি মূল্যবান করে তুলেছে। তার এই বিবরণ থেকে আমরা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় অবস্থানসহ সে সময়কার বাংলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি।

---

৩. "ইবনে বতুতার সফর নামা" পূর্বক্ত পৃ-১০৫।
৪. ঐ পৃ.–১২৮।

www.pathagar.com

ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ কাহিনী

আমরা সমুদ্রে ৪৩ দিন কাটালাম। অতঃপর আমরা বাংলায় পৌঁছুলাম। এটি চালে পরিপূর্ণ এক বিশাল দেশ। পৃথিবীতে আমি কোন দেশ দেখিনি যেখানে এখানকার চেয়ে সস্তায় পণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু এটি কুয়াশায় ভরা। খোরাসান থেকে আগত লোকেরা একে বলে 'দোজখ-ই-পুর নিয়ামত' যার অর্থ নেয়মত, সম্পদ পূর্ণ নরক। আমি এখানকার বাজারে দিল্লির ২৫ রতল (ওজনের) চাল এক রৌপ্য দিনারে বিক্রি হতে দেখেছি। দিল্লির ১ রতল মাগরিব (মরককো)-এর ২০ রতলের সমান। আমি অধিবাসীদের বলতে শুনেছি, এ মূল্য তাদের জন্য বেশি (সাধারণ প্রচলিত মূল্যের তুলনায়।) মাগরিবের অধিবাসী মুহম্মদ আল-মাসুদী একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আগে বাংলায় বাস করতেন এবং দিল্লিতে আমার বাড়িতে মারা যান। আমাকে বলেছিলেন যে, (বাংলায় থাকা কালে) তাঁর এক স্ত্রী এবং একজন চাকর এই তিন জনের সারা বছরের (চলার) প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য প্রায় ৮ দিরহাম খরচ হতো। তিনি ৮ দিরহামে দিল্লির ৮০ রতল দরে ধান কিনতেন। এই ধান থেকে চাল বের করা হতো। তিনি ৫০, রতল চাল পেতেন, যা ছিল ১০ কানতার সমান। আমি বাংলায় দুধের গরু ৩ রৌপ্য দিনারে বিক্রি হতে দেখেছি। এখানকার গরু মহিষের মত কাজ করে অর্থাৎ মহিষের কাজ গরু দিয়ে করানো হয়। মোটাতাজা মুরগি এক দিরহামে ৮টি বিক্রি হতে দেখেছি। কবুতর ১৫টির মূল্য ১ দিরহাম। ২ দিরহামে ১টি তাজা ভেড়া বিক্রি হতে দেখেছি। দিল্লির ১ রতল চিনি চার দিরহামে, ১ রতল সিরাপ ৮ দিরহাম, এক রতল তিল তেল ২ দিরহামে। উৎকৃষ্ট মানের ৩০ হাত একটি মিহি কাপড় আমার উপস্থিতিতে ২ দিনারে বিক্রি হতে দেখেছি। উপপত্নী হবার যোগ্য একটি সুন্দরী এক স্বর্ণ দিনারে বিক্রি হতে দেখেছি যা মাগরিবের ২১/২ স্বর্ণ দিনারের সমান। আমি প্রায় একই দামে আশুরা নামে অত্যন্ত সুন্দরী এক ক্রীতদাসী বালিকা ক্রয় করি। আমার এক সাথী লুলু (মুক্তা) নামে অল্প বয়সী এক দাস দুই স্বর্ণ দিনারে কেনেন।

বাংলার প্রথম যে শহরে আমরা ঢুকি তা সাদকাওয়ান। বিশাল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বিরাট শহর। গঙ্গা নদী, যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করতে যান, আর যমুনা নদী সমুদ্রে পড়ার আগে যেখানে একসঙ্গে মিলেছে তার কাছেই এই শহর। নদীতে বাঙালিদের অসংখ্য জাহাজ আছে যার সাহায্যে তারা লখনৌতির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

বাংলার সুলতান

ইনি সুলতান ফখরুদ্দীন। ডাকনাম ফখরা, যিনি একজন বিশিষ্ট সুলতান। তিনি বিদেশীদের, সর্বোপরি ফকির দরবেশের ভালবাসেন। সুলতান বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীনের হাতে এই দেশের কর্তৃত্ব ছিল। নাসিরুদ্দীনের পুত্র মুইজউদ্দীনের উপর দিল্লির কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় এবং নাসিরুদ্দীন এই পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য

www.pathagar.com

স্বসৈন্য অভিযান করেন। তাঁরা গঙ্গা নদীর তীরে মিলিত হন। তাঁদের সাক্ষাৎ 'দুই শুভ তারার মিলন' নামে অভিহিত। আমরা আগেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং এ-ও যে, কিভাবে নাসিরুদ্দীন তার পুত্রের পক্ষে দিল্লির সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং বাংলা ফিরে যান। তিনি আমৃত্যু সেখানেই (বাংলায়) অতিবাহিত করেন। তাঁরপর তাঁর অন্য এক পুত্র সামসুদ্দীন ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্থালাভিষিক্ত হন পুত্র শিহাবুদ্দীন। শিহাবুদ্দীন তাঁর ভাই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বুর কর্তৃক পরাজিত হন।

শিহাবুদ্দীন দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে সাহায্য করেন এবং বাহাদুর বুরকে বন্দি করেন। পরবর্তীতে গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের পুত্র মুহম্মদ তুঘলক ক্ষমতা লাভের পর তাঁকে মুক্তি দেন এই শর্তে যে, তিনি মুহম্মদ তুঘলক-এর সঙ্গে যুক্তভাবে বাংলা শাসন করবেন। তিনি বাহাদুর পুনরায় তাঁর (মুহম্মদ তুঘলক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। মুহম্মদ যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন। তিনি (মুহম্মদ) তাঁর শ্যালককে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন যিনি সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন। আলী শাহ তখন লখনৌতি অঞ্চলে ছিলেন। তিনি বাংলা প্রদেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। যখন ফখরুদ্দীন দেখলেন যে, সুলতান নাসিরুদ্দীনের বংশের রাজকীয় কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে, (তিনি নাসিরুদ্দীনের মুক্তকৃত দাস ছিলেন) তিনি সাদকাওয়ানে এবং বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করে নিজকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁর এবং আলী শাহের মধ্যে এক প্রচণ্ড শত্রুতা শুরু হয়। শীত আর বর্ষায় ফখরুদ্দীন লখনৌতী অঞ্চল আক্রমণ করতেন, কিন্তু বর্ষা চলে গেলে (গ্রীষ্মে) আলী শাহ স্থলপথে বাংলা আক্রমণ করতেন, কারণ তিনি স্থলে শক্তিশালী ছিলেন।

ফকীরদের প্রতি সুলতান ফখরুদ্দীনের শ্রদ্ধা এত বেশি ছিল যে, তিনি তাদের একজনকে সাদকাওয়ানে নিজের গভর্নর (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেন। এই লোকটির নাম ছিল শায়দা (প্রেম-পাগল)। সুলতান তাঁর এক শত্রুর বিরুদ্ধে বাইরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কালে শায়দা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইচ্ছা যে স্বাধীন হবেন। সুলতানের এক পুত্রকে হত্যা করেন (এই পুত্র ছাড়া সুলতানের অন্য কোনো পুত্র ছিল না।)

ফখরুদ্দীন এটা জানতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে ফিরে আসেন। শায়দা এবং তার সমর্থকরা সোনারগাঁ নগরের দিকে পালিয়ে যান। এই নগরী খুবই দুর্ভেদ্য ছিল। সুলতান এই নগরী অবরোধের জন্য তাঁর সেনাবাহিনী পাঠান। নগরীর অধিবাসীরা জীবনের ভয়ে শায়দাকে ধরে সুলতানের সৈন্যদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সুলতানের কাছে তারা এ খবর পাঠালে সুলতান বিদ্রোহীর মস্তক তাঁর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং তা করা হয়। বহু ফকিরকে তাদের সাথীর আচরণের জন্য হত্যা করা হয়। সাদকাওয়ানে আমরা আসার সময়ে আমি এই শহরের সুলতানের দর্শন করিনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপও হয়নি, কেননা তিনি দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আমি অন্য রকম (দেখা করলে) করলে তার ফল কী হতো সে ব্যাপারে আমার ভয় ছিল।

www.pathagar.com

আমি সাদকাওয়ান ত্যাগ করে কামরু (কামরুপ) পর্বতমালার দিকে যাত্রা করি। এ ছিল এক মাসের পথ। কামরু পর্বতমালা বিরাট যা চীন হয়ে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত, মৃগনাভীর হরিণ প্রাপ্তির জায়গা। এই সব পাহাড়ি অধিবাসীদের সঙ্গে তুর্কীদের মিল আছে। তারা খুবই পরিশ্রমী। ফলে তাদের গোত্রের একজন ক্রীতদাসের মূল্য অন্য যে কোন জাতের ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি। তারা তাদের যাদুবিদ্যা পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ এবং এ বিষয়ে তারা বিশেষ অনুরাগী। এই পার্বত্য অঞ্চলে আমার যাবার উদ্দেশ্য ছিল একজন দরবেশ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যিনি সেখানে বাস করতেন। তিনি ছিলেন শেখ জালালউদ্দিন-আল-তাবরিজি।

শেখ জালাল উদ্দীন

তিনি প্রধান দরবেশের মধ্যে গণ্য হতেন এবং অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অনেক মহৎ কাজ করেছিলেন এবং অনেক অলৌকিক (কারামাত) ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ। আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহকে দেখে ছিলেন এবং খলিফার হত্যার সময়ে বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন।[৬] পরবর্তীকালে তাঁর (দরবেশের) মুরীদগণ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি ১৫০ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রোজা পালন করেন।

লাগাতার দশদিন পর ছাড়া তিনি রোজা ভঙ্গ করতেন না। তাঁর একটা গরু ছিল। এর দুধ পান করে তিনি রোজা ভাঙতেন। তিনি দাঁড়িয়ে সারারাত ইবাদত করতেন। তিনি পাতলা ও দীর্ঘদেহী ছিলেন। খুবই সামান্য দাঁড়ি ছিল তাঁর। এই পাহাড়ি এলাকার অধিবাসীগণ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একারণেই তিনি তাঁদের মধ্যে বাস করতেন।

শেখের মোজেজা

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলেছেন, তিনি মৃত্যুর আগের দিন তাঁদের অনেককে ডেকে পাঠান ও আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দেন। বলেন, "এ সত্য যে, আল্লাহ্ চান তো আগামী কাল আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো এবং তোমাদের মধ্যে আমার উত্তরাধিকারী তারাই হবে যাদের এক খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকবে না।" পরবর্তী দিন জোহরের নামাজ আদায়ের সময় সর্বশেষ সিজদারত অবস্থায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। যে গুহায় তিনি বাস করতেন তার পাশেই তাঁর শিষ্যগণ একটা কবর খোঁড়া দেখতে পান যার কাছেই ছিল কাফন এবং সুগন্ধি। তারা তাঁকে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে উক্ত কবরে দাফন করেন। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।

---

৬. *১২৫৮ খ্রি. হালাকু খান বাগদাদ দখলের পর খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ নিহত হন: অর্থাৎ এই সাক্ষাৎকারের ৮৮ বছরের পূর্বের ঘটনা (ইয়ুল, ক্যাথে এন্ড দি ওয়ে থিদার, পৃ. ৪১৬)।*

www.pathagar.com

শেখের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা

আমি যখন শেখের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম, তাঁর বাসস্থান থেকে দুই দিনের দূরত্বে তাঁর ৪ জন শিষ্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে জানান যে, তাঁদের গুরু (পীর) তাঁর কাছে উপস্থিত ফকিরদের খবর দেন যে, "পশ্চিম থেকে একজন ভ্রমণকারী তোমাদের কাছে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য যাও।" তাঁরা আরও বলেন যে, শেখের নির্দেশে সে উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। ঘটনা হলো শেখ আমার সম্পর্কে কোনকিছু জানতেন না, কিন্তু এগুলি তাঁকে অলৌকিকভাবে জানানো হয়েছিলো।

এই লোকদের সঙ্গে আমি শেখের দর্শনের জন্য যাত্রা করে তাঁর আস্তানায় (গুহার বাইরে অবস্থিত) উপস্থিত হই। তাঁর আস্তানার কাছে কোনো জনবসতি ছিল না। তবু দেশের লোকেরা, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে, শেখের দর্শন করার জন্য আসতো। তাঁর জন্য উপহার উপঢৌকন আনতো। এসব সামগ্রীর উপরই ফকির ও মুসাফিরগণ জীবন ধারণ করতেন। শেখের সম্পদ বলতে একটি গাভী ছিল, যার দুধ পান করে তিনি দশদিন পর পর রোজা ভাঙতেন, যা আমি আগেই বলেছি। তাঁর দরবারে আমি উপস্থিত হলে তিনি উঠে দাঁড়ান। আমাকে আলিঙ্গন করেন। আমার দেশ এবং ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি তাঁকে আমার বৃত্তান্ত বলি। তিনি আমাকে বলেন, "প্রকৃতই আপনি আরবদের পরিব্রাজক।" সেখানে উপস্থিত তাঁর শিষ্যগণ যোগ করেন, "এবং অনারবদেরও পরিব্রাজক, হে আমাদের শেখ।" তিনি জবাবে বলেন, "এবং অনারবদেরও। সুতরাং সেভাবে তাঁর সেবা যত্ন কর।' আমাকে তাঁর আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমি তিন দিন আতিথেয়তা গ্রহণ করি।

শেখের অলৌকিক বিস্ময়কর সত্য ঘটনাবলির বিবরণ

যেদিন আমি শেখের আস্তানায় সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তাঁর গায়ে ছাগ-চর্মে তৈরি একটি পোশাক দেখতে পাই। এ আমার খুব পছন্দ হয়। আমি মনে মনে বলি, "আল্লাহ করুন যেন শেখ ওটি আমাকে দেন।" যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করি, তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তার আস্তানার এক কোণে যান। তাঁর পোশাকটি শরীর থেকে খুলে আমাকে পড়িয়ে দেন। একটা উঁচু টুপিও তিনি তাঁর মাথা থেকে খুলে আমাকে দেন। তিনি নিজে একটা ছেঁড়া ও তালিযুক্ত জামা গায়ে দেন। উপস্থিত ফকিররা আমাকে জানান যে, শেখ সাধারণত এই পোশাক পড়েন না। তিনি আসার আগে এটি পড়েছিলেন এবং তাঁদের বলেছিলেন, "মাগরিবের অধিবাসী লোকটি এই পোশাকটি চাইবে। একজন বিধর্মী রাজা তাঁর কাছ থেকে এটি নিয়ে নেবে এবং এটি আমাদের ভাই বুরহানউদ্দীন আসাগারজীকে দিয়ে দেবে। এটি তাঁরই এবং তাঁর ব্যবহারের জন্যেই তৈরি হয়েছে।" যখন ফকিরেরা এইসব আমাকে বলল, তখন

www.pathagar.com

আমি তাদের বললাম, "আমি শেখের দোয়া পেয়েছি, কারণ তিনি তার পোশাক আমাকে পরিয়েছেন। আমি এই পোকাশ পড়ে কোন রাজদরবারে কখনই যাবো না, সে মুসলিম বা বিধর্মী যে কোন সুলতানই হোক না কেন?"

আমি শেখের কাছ থেকে বিদায় নিই। এর অনেক পরে আমি চীনে যাই এবং খানসা শহরে পৌঁছি। ভিড়ের কারণে আমার সাথী আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমার পড়নে আলোচ্য পোশাকটি ছিল। আমি রাস্তায় চলছিলাম। উজির এক লম্বা মিছিল নিয়ে এলেন। আমার প্রতি তাঁর নজর পড়লো। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কখন এসেছি। আমাকে যেতে দিলেন না যতক্ষণ না আমরা রাজপ্রাসাদে পৌঁছলাম। আমি তখন তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে আটকালেন এবং যুবরাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে মুসলিম সুলতানের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি যখন জবাব দিচ্ছিলাম তখন তিনি আমার পোশাকের দিকে দৃষ্টি দিলেন ও প্রশংসা করলেন। উজির আমাকে এটি খুলে ফেলতে বললেন। আমার পক্ষে ঐ নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না। রাজা পোশাকটি নিলেন এবং আমাকে দশটি মূল্যবান পোশাক, একটি সুসজ্জিত ঘোড়া এবং কিছু মুদ্রা দেবার নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনায় আমি মনে খুব আঘাত পাই। পরবর্তীকালে আমার শেখের কথা স্মরণ হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, একজন বিধর্মী রাজা পোশাকটি নিয়ে নেবে। এই ঘটনায় আমি খুব হতবাক হই।

এক বছর পর আমি চীনের রাজা খান বালিকের (পিকিং) প্রাসাদে পৌঁছি এবং বুরহানউদ্দীন আসাগারজীর আস্তানায় যাই। আমি তাঁকে পাঠরত দেখি। তাঁকে সেই একই পোশাক (ছাগ চর্মে তৈরি) পরা দেখতে পাই। এই ঘটনায় আমি খুবই অবাক হই। বার বার আমি হাত দিয়ে উল্টেপাল্টে সেটি দেখতে থাকি। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, "তুমি এতে এত কী দেখছ? তুমি তাহলে এটা চেন?" আমি জবাবে বললাম, "হ্যাঁ, এটা সেই পোশাক যা আমার কাছ থেকে খানসার রাজা কেড়ে নিয়েছিলেন।" তিনি বললেন, "এই পোশাক আমার ভাই জালাল উদ্দীন আমার জন্য তৈরি করেছেন। তিনি আমাকে লিখেছেন যে, পোশাকটি ওমুক ওমুকের হাত ঘুরে আমার কাছে আসবে।" অতঃপর তিনি আমাকে চিঠিটি দেন। আমি সেটি পড়ে এবং শেখের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী দেখে আশ্চর্যান্বিত হই। আমি শেখ বুরহানউদ্দীনকে কাহিনীর শুরুটা বলি। তিনি আমাকে বলেন যে, "আমার ভাই জালাল উদ্দীন এখন এসবের ঊর্ধ্বে। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।" তিনি আরও বলেন যে, "তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাজ মক্কাতে পড়তেন এবং প্রতি বছর হজব্রত পালন করতেন।" তিনি আরাফাতের দিন এবং কোরবানীর ঈদের দিন-এই দু'দিন গায়েব হয়ে যেতেন। কেউ জানতো না তিনি কোথায় গিয়েছেন।

www.pathagar.com

শেখ জালালউদ্দীনকে বিদায় জানিয়ে আমি হবাঙ্ক শহরের দিকে যাই। এই শহরটি অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোরম। এর মধ্যে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত রয়েছে। এটি কামরূপের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, যাকে 'আন নাহার আল আজরাক' বলা হয় (নীল নদী) এই নদী দিয়ে বাংলায় এবং লখনৌতি পৌছা যায়।

নদীর উভয় তীরে জলচক্র (water wheel) বাগিচা এবং গ্রাম, যেমনটি মিশরে নীল নদের দুধারে রয়েছে। এসব গ্রামের অধিবাসীগণ মুসলিমদের দ্বারা শাসিত মূর্তিপূজক। তাদের উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক খাজনা হিসেবে আদায় করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য কর ছিল। এই নদী দিয়ে আমরা ১৫ দিন সফর করি, বিভিন্ন গ্রাম এবং বাগিচার মাঝ দিয়ে, যেন আমরা একটা বাজার এলাকার (গঞ্জের) মধ্য দিয়ে যাই।

নদীতে অসংখ্য নৌকা এবং প্রত্যেক নৌকায় একটি করে ঢোল। যখনই দু'টি নৌকা একত্রিত হয় তখন প্রত্যেক নৌকার মাঝি ঢোল বাজায় এবং নাবিকেরা একে অপরকে সালাম জানায়। সুলতান ফখরুদ্দীন ফকির দরবেশদের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া না নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। যাদের কাছে সফর করার কিছু নেই তাদেরকে সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন কোন ফকির গ্রামে আসে তাকে আধা দিনার দেয়া হয়।

নদীপথে ১৫ দিন সফরের শেষে, যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, আমরা সোনারগাঁ শহরে উপস্থিত হই। ফকির শায়দা যখন এখানে আত্মগোপন করেছিল তখন এই স্থানের জনসাধারণ তাঁকে আটক করেছিল। এখানে এসে আমরা একটা চীনা জাঙ্ক দেখতে পাই, যা ৪০দিনের পথ জাভায় যাবার জন্য প্রস্তুত। আমরা সেই জাঙ্কে চড়ি এবং ১৫ দিন যাত্রার পর বরাহনগর অঞ্চলে পৌছি। এর অধিবাসীদের চেহারা কুকুরের মতো।

ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে তার ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক উৎস হিসেবে তার এ বিবরণ বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত।

ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে মালদ্বীপ সম্পর্কে এক চমৎকার তথ্য দেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালদ্বীপ ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। মালদ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন একজন নারী। তিনি বলেন, "এখানকার শাসনকর্তা খাদিজা নামী একজন মহিলা। এক সময় তার পিতামহ ছিলেন শাসনকর্তা, তার পরে ছিলেন তার পিতা।"[৭] এভাবে ইবনে বতুতা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তার বিবরণ তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেন। তার এ ভ্রমণ কাহিনী ৭৫৬ হিজরীর ৩রা জেলহজ (৯ই ডিসেম্বর ১৩৫৫খ্রি.) শেষ হয়।

---

৭. *ঐ পৃ-১৩৭।*

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইসামী

মধ্যযুগে ভারতীয় মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইসামী ছিলেন অন্যতম। তিনি "ফুতুহ-আল-সালাতীন" নামে এক ঐতিহাসিক মহাকাব্যটি রচনা করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার এ গ্রন্থ মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম শাসনের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত।

পরিচয়

ঐতিহাসিক ইসামী ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান ইলতুত মিশের সময় (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণ হলে সেখান থেকে বহু অভিজাত পরিবার ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। ইসামীর পরিবারও তাদের সাথে আসে। ইসামী নিজেকে আরব বংশোদ্ভূত বলেছেন। তিনি ছোট বেলাতে তার বাবাকে হারান। তিনি তার দাদা ইয়ায-উদ-দীনের সাথে দিল্লিতে বসবাস করতে থাকেন। তার দাদা সুলতান ইলতুতমিশের একজন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। ইসামীর পুরো নাম ছিল খাজা আবদুল্লাহ মালিক ইসামী। তিনি ৪০ বছর বয়সে তার এ বিখ্যাত মহাকাব্যটি রচনা করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহমানী সুলতান আলা-উদ-দীন বাহরাম শাহের নামে তার এ বিখ্যাত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

"ফুতুহ-আল-সালাতীনের" বিষয়বস্তু

ইসামী তার গ্রন্থে গজনীর সুলতান মাহমুদ থেকে দিল্লির সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৫০ বছরের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদকে ইসলামের একজন মহান সেবক হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরির মৃত্যু সম্পর্কে এক অদ্ভুত তথ্য দেন। আর তা হলো চৌগন (পোলো) খেলা অবস্থায় মোহাম্মদ ঘুরি পড়ে মৃত্যুর কারণ ছিল সুফী-সাধকের অভিশাপ। কারণ সুলতান ট্যানারী ব্যবসায়িদেরকে দূরে গিয়ে ব্যবসা করতে বললে সুফী-সাধকরা তার প্রতি ক্ষীপ্ত হলে এ দুর্ঘটনা হয়। তিনি সুলতানা রাজিয়ার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রচনা করেন। তিনি মুহম্মদ-বিন-তুঘলক সম্পর্কে সবচেয়ে বীরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কারণ সুলতান যখন দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং

www.pathagar.com

জনগণকে সেখানে যেতে বাধ্য করেন তখন তিনি তার পিতাকে হারান। এ কারণে তিনি সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনা করেন। তার এ বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থটি পারশ্যের মহাকবি ফেরদৌসীর ডঙ্গে লেখা।

সমালোচনা

১. তার এ গ্রন্থটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত।

২. তিনি তার এ গ্রন্থের কোন উৎসের নির্দেশ করেননি।

৩. তিনি সুলতানা রাজিয়া সম্পর্কে যে সব আপত্তির তথ্য দেন তা মোটেও সত্য নয়।

৪. তিনি কবি হিসেবে যশ ও খ্যাতি লাভ করবার আশায় তার গ্রন্থ রচনা করেন।

৫. তিনি বাহরাম শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার আশায় তার নামে গ্রন্থটি লেখেন।

৬. তিনি দিল্লির সুলতান মুহম্মদ-বিন তুঘলক সম্পর্কে যে সব তথ্য দেন তা মোটেও সত্য নয়। তিনি সুলতানাকে এজিদ ও ফেরাউনের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে এসব তথ্য দেন।

৭. এতে ইতিহাসের থেকে কবিতার স্থানই বেশি। যাতে কবি মনের কল্পনার স্থান পেয়েছে।

৮. সন, তারিখ সম্বন্ধে ইসামী উদাসীন ছিলেন।

৯. তিনি মাঝে মাঝে স্ব-বিরোধী মন্তব্য করেছেন। যেমন– তিনি বলেছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের সময়ে শুধু দিল্লির অধিবাসীদেরকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল। আবার তিনি বলেন যে, শুধু অভিজাত ও অমাত্যদেরকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়।

মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক ইসামীর বিবরণ বিশদ। তার লেখা সহজ, সরল। ঐতিহাসিক পি. হার্ডি ও ড. মাহদী হোসেন তার লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক ড. মাহদী হোসেন বলেন, "ফুতুহ-আল-সালাতীন" মধ্যযুগীয় ভারতের শাহনামা সাদৃশ্য। এটি ইতিহাস অপেক্ষা মহাকাব্য হিসেবেই অধিক প্রখ্যাত বলা যেতে পারে।'

মধ্যযুগের সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনায় ইসামীর "ফুতুহ-আল-সালাতীন" ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যদিও এটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় তারপরও এর গুরুত্বকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মুঘল আমলের ইতিহাস, রচনা ও বাবুর নামা, গুলবদন বেগম

মুঘল আমলে ইতিহাসচর্চার স্বরূপ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

নিম্নে মুঘল আমলে ইতিহাসচর্চার স্বরূপ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. আত্মজীবনীমূলক রচনা

মুঘল আমলের ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস রচনা। ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরই (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি) সর্বপ্রথম মুঘল আমলের ইতিহাসচর্চার এ ধারা শুরু করেন। সাধারণত দরবারী ঐতিহাসিক দ্বারা ইতিহাস লেখা হত। যদি সম্রাট নিজে ইতিহাস লিখতেন তাহলে তাকে বলা হত "তুযুক,"। যেমন– বাবর তার আত্মজীবনী, "তুযুক-ই-বাবরী" বা "বাবুর-নামা" রচনা করেন। এ রচনায় তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি লিখেছেন। সে সাথে নিজ দেশের ও ভারতের ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক অবস্থার এক অপূর্ব নির্দশন তিনি তুলে ধরেন। আবার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর "তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর" নামে তার আত্মজীবনী রচনা করেন। এগুলো হল আত্মজীবনীমূলক রচনা।

২. চরিত ইতিহাস রচনা

মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার অনেক ক্ষেত্রে সম্রাটদের নির্দেশে মুঘল ঐতিহাসিকরা চরিত ইতিহাস রচনা করেন। যেমন– মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের প্রধান পানিবাহক ও সহচর জওহর আফতাবচী "তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত", সম্রাট বাবরের কন্যা ও সম্রাট হুমায়ুনের ছোট বোন গুলবদনের লেখা "হুমায়ুন নামা", হায়দার মীর্জা রচিত "তারিখ-ই-রশীদী" প্রভৃতি ছিল চরিত ইতিহাস।

৩. রাজবংশীয় ইতিহাস

ভারতে মুঘল ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজবংশীয় ইতিহাস। যেমন–আব্বাস খান শেরওয়ানী রচিত "তারিখ-ই-শেরশাহী", খাজা নিয়ামত উল্লাহ রচিত "তারিখ-ই-খানজাহানী," শায়খ নুরুল হক রচিত "যুবদাতুত-তাওয়ারিখ,"

www.pathagar.com

"আবদুল কাদের বদাউনী রচিত "মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ," নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশী রচিত" "তবাকাত-ই-আকবরী" প্রভৃতি হলো রাজবংশীয় ইতিহাস।

৪. দরবারি ইতিহাস

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) থেকে দরবারি ইতিহাস লেখা শুরু হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারি ইতিহাস লেখা শুরু হয়। এ পৃষ্ঠপোষকতা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। আবুল ফযলের "আকবর নামা" ও "আইন-ই-আকবরী" মুতামাদ খানের "ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরী," আবদুল হামিদ লাহোরীর "পাদশানামা," ইনায়েত খানের "শাহজানাম নামা," মুহম্মদ কাযিমের "আলমগীর নামা," সাকী মুসতাইদ-খানের "মাসিরি-ই-আলমগীরী" প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল দরবারি ইতিহাস গ্রন্থ।

৫. প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ইতিহাস

মুঘল আমলে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন– গোলাম হোসেন সলিম রচিত "রিয়াজ-উস-সালাতীন," গোলাম হোসেন খান তবাতকায়ি রচিত" সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন," মুনশী সলিমুল্লাহ রচিত "তারিখ-ই-বাংলা" ইউসুফ আলী খান রচিত" তারিখ-ই-বাংলা-ই মহাবতজঙ্গী' করম আলী খান রচিত "মোজাফফর নামা," আযাদ আল হোসাইনীর মাত্র ৯ পৃষ্ঠায় লেখা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের জীবনী গ্রন্থ "নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানী" প্রভৃতি ছিল আঞ্চলিক ইতিহাসের উদাহরণ।

৬. মুঘল ইতিহাসের সার্বজনীন রূপ লাভ

মুঘল আমলে (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে মুঘল ইতিহাস সার্বজনীন রূপ লাভ করেন। কারণ এ ইতিহাসচর্চায় রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐতিহাসিকদের রচনায় ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মুঘল আমলে ইতিহাসের সার্বজনীন রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে এ রূপ ইতিহাসচর্চাকে গতিশীল করে।

৭. নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুঘল ঐতিহাসিকরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে ধরে ইতিহাস রচনা করতেন। কেউবা রাজনৈতিক, কেউবা রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখতেন। আবার দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাসকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা হত।

www.pathagar.com

৮. বর্ণনামূলক

মুঘল ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বর্ণনামূলক লেখা। মুঘল ঐতিহাসিকরা মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালের বিস্তারিত ইতিহাস লিখে রাখতেন।

৯. প্রশস্তিমূলক

মুঘল ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশস্তিমূলক ইতিহাস লেখা। ঐতিহাসিকরা সম্রাটের উদার পৃষ্ঠপোষকতার আশায় সম্রাটের গুণগান করবার জন্য ইতিহাস লিখতেন।

১০. তথ্যমূলক

মুঘল ঐতিহাসিকদের লেখায় দেখা যায় যে, তাদের লেখা ছিল তথ্যমূলক। লিখিত, অলিখিত, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে মুঘল ঐতিহাসিকরা তাদের লেখা লিখতেন। যেমন– আবুল ফযলের "আকবর নামা" ও "আইন-ই-আকবরীর" নাম করা যায়।

বাবুর নামা

মুঘল ইতিহাসের উৎস হিসেবে "তুযুক-ই-বাবুরী" বা "বাবুর নামা" গ্রন্থের গুরুত্ব হলো অপরিসীম। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর কর্তৃক তুর্কী ভাষায় রচিত "বাবুর নামা" গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলেও "বাবুর নামা" সমকালীন মুঘল ইতিহাস পুনঃগঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

"বাবুর নামা" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

বাবর তার আত্মজীবনী এভাবে শুরু করেছেন। 'হিজরী ৮৯৯ সালের রমযান মাসে বারো বছর বয়সে আমি ফারগানার "সিংহাসনে আরোহণ করলাম।"[১] বাবরের আত্মজীবনী থেকে আমরা বাবরের সমগ্র দিক এবং সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

১. বাবরের জন্ম ও বংশ পরিচয়

ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র পরগনা ফারগানার অধিবাসী। পিতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত বীর তৈমুর লংয়ের বংশধর। আর মাতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আরেক বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খানের বংশধর। এসব তথ্য বাবর তার আত্মজীবনী "বাবুর নামায়" উল্লেখ করেছেন।[২]

---

১. *"বাবুর নামা" জহীর-উদ-দীন মুহম্মদ বাবুর (অনু প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ) প্রথম খন্ড ঢাকা-২০০৪ পৃ-২।*

২. *"বাবুরনামা" (অনু-প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ) প্রথম খণ্ড প্রাগুক্ত।*

www.pathagar.com

২. বাবরের সিংহাসন লাভ ও মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা

বাবরের পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন ফারগানা রাজ্যের অধিপতি। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১২ বছর বয়সে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফারগানা রাজ্যের অধিপতি হন। কিন্তু, উযবেক নেতা সাইবানী খান কর্তৃক তিনি সিংহাসন চ্যুত হয়ে হারানো রাজ্য ফিরে পেতে ব্যর্থ চেষ্টা চালান। এরপর তার দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে পড়ে।

৩. ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বাবর তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, মধ্য এশিয়ায় ব্যর্থ হয়ে বাবর ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন। ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য তাকে ভারত জয়ে প্রলুব্ধ করে। এরপর দৌলত খান লোদী ও মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ[৩] বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানান। তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল পানিপথের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। বাবরের সৈন্য ছিল ১২,০০০ হাজার আর ইব্রাহীম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ও হাতী ছিল ১,০০০ হাজার। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ও দিল্লির সুলতানী আমলের শেষ শাসক ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেন। এর পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহকে এবং ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

৪. আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

যদিও বাবর ভারতে দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেননি তারপরও তার আত্মজীবনী থেকে সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র অনুধাবন করা যায়। বাবর ভারতকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পূর্ণ দেশ হিসেবে উল্লেখ করলেও এদেশের মানুষ, আচার-ব্যবহার, পশু-পাখি, ফুল-ফল, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বাবর বলেন, "হিন্দুস্তানে কোন উল্লেখযোগ্য আমোদ-উল্লাসের ব্যবস্থা নাই। বাসিন্দারা দেখতে সুন্দর নয়। বন্ধু সমাজের আকর্ষণ, পরস্পর দিল খোলা মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার অনুশীলন-এ সব সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নাই। তাদের প্রতিভা নাই, বিচার শক্তি নাই, ভদ্র ব্যবহার নাই, দয়ামায়া নাই, শিল্প-নৈপুণ্য নাই, তাদের শিল্প কাজের কোন পরিকল্পনা নাই, ভাস্কর্য হিন্দুস্তানের ক্রটি ও দক্ষতা নাই, তাদের ঘোড়া নাই, ভাল গোস্ত নাই, আঙুল নাই, সরদা নাই, ভাল খাদ্য নাই, বাজারে রুটি নাই, বরফ নাই, ঠাণ্ডা পানি নাই, গোসলখানা নাই, মশাল নাই, আছে কতগুলি নোংরা মানুষ– নাম তাদের দিয়াতী

---

৩. *"বাবুর নামা" দ্বিতীয় খণ্ড ঢাকা-২০০৪।*

www.pathagar.com

(প্রদীপ বাহক)। তাদের বাঁ হাতে থাকে তেপায়ার মত একটা কিছু, তার পায়ার সাথে থাকে একটি দীপের শলিতা। তাদের ডান হাতে লাউয়ের বশ, বশের মধ্যে থাকে তেল। দীপের তেল ফুরিয়ে গেলে এই বশ থেকে তেল ঢেলে দেওয়া হয়। ধনী হিন্দুরা এক দুইশ করে এই দিয়াতী পুষে থাকে।

তাদের নদী আছে, বিল আছে, ঝর্ণাধারা আছে। তাদের বাগিচায় বা ইমারতে পানির নহর নাই। তাদের দালান ইমারতে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় নাই। তাদের চাষী ও দিন মজুরের সবাই ন্যাংটা অবস্থায় বাইরে ঘোরে। অবশ্য তারা একটা সরু বস্ত্রাংশ কোমরের সামনে থেকে নিয়ে কোমরে প্যাঁচানো একটি দড়ির সাথে পেছনে বাঁধে। মেয়েরা ডুমা পরে, একখণ্ড কোমর থেকে নিচের দিকে ও অন্য খণ্ড মাথা পর্যন্ত পৌঁছে।"

বাবর কিন্তু সব সময় ফারগানা ও সমরকন্দে দ্রাক্ষা ও তরমুজের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। তিনি তার নিজ দেশের আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। বাবর এসব স্পষ্ট কথা তার আত্মজীবনীতে খুবই আন্তরিকতার সাথে প্রকাশ করেছেন যার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

৫. বাবরের নিজ চরিত্র

বাবর তার আত্মজীবনীতে নিজের চরিত্রের নম্রতা ও কঠোরতা এক অপূর্ব-সংমিশ্রণের কথা বলেছেন। তিনি তার বাল্যকালের খেলার সাথীদের স্মৃতি স্মরণ করে অনেক সময় নিরবে কেঁদেছেন। আবার বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর মনোভাবের কথাও বলেছেন।

৬. অসাধারণ পুত্র স্নেহ

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা হুমায়ুন এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। রাজ্যের সব বিজ্ঞ চিকিৎসক হুমায়ুনের অসুখ ভাল হবার আশা ছেড়ে দেন। এমন সময় আবুল বাকা নামক একজন নিতান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি[৪] বাবুরের কাছে বললেন যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণের বদলে প্রাণের সদকা কবুল হয়ে থাকে। তখন বাবর বলেন যে, আমার নিজের জীবন আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়। তাই হুমায়ুনের প্রাণের বদলে আমার নিজের প্রাণ আমি আল্লাহর কাছে সদকা দিলাম এ বলে বাবর হুমায়ুনের বিছানার চারপাশে তিনবার ঘুরে আকাশের পানে হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় মগ্ন হলেন। এর কিছুক্ষণ পরে তিনি বলে উঠলেন "আমি অসুখ সারিয়ে নিয়ে এসেছি, আমি অসুখ সারিয়ে নিয়ে এসেছি।" এ বলার সাথে সাথে হুমায়ুন সুস্থ হতে থাকলেন আর বাবর ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হতে থাকলেন। অবশেষে বাবর ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৪. "বাবুর নামা" দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ.-২১৩।

www.pathagar.com

৭. নির্ভরযোগ্য ইতিহাস

"বাবুর নামা" একটি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ সম্পর্কে ড. এস. কে ব্যানার্জি বলেন, "It is the Bible of the Mughal history of India and any fact quoted from or supported by it is placed beyond all doubt" অর্থাৎ "এটা ভারতের মুঘল ইতিহাসের বাইবেল সদৃশ এবং যে কোন ঘটনা যদি এতে বিবৃত থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তা গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছে।" বাবর এতে বিজিত আফগান ও লোদীদের প্রতি তার উদারতার ও ন্যায়নীতির যেমন বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি তার দোষ-ত্রুটির কথাও গোপন করেননি। তিনি যে মদ পান করতেন তা তিনি অকপটে স্বীকার করেন।

৮. ইতিহাস সাহিত্য

"বাবুর নামা' একটি উঁচু স্তরের সাহিত্য। পৃথিবীর ৫টি জীবনী গ্রন্থ ধরলে এ গ্রন্থ তার মধ্যে পড়বে। তুর্কী ভাষায় রচিত ইতিহাস নির্ভর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির রচনা শৈলী অপূর্ব ও সাবলিল। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "Soldier of fortune as he was Babur was not the less a man of fine literary taste and fastidious critical perception." অর্থাৎ "সৈনিক হিসেবেতো বটেই সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবেও তিনি কম খ্যাতিমান ছিলেন না।"

মূল্যায়ন

বাবর এ দেশের মানুষ আবহাওয়া, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির-কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। এদেশের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তিনি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আবার তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে এ দেশ সম্পর্কে প্রশংসা করতেও ভুল করেননি। এ দেশের মানুষ সম্পর্কে যেমন তিনি বলেছেন তারা দেখতে সুন্দর নয়, তাদের ব্যবহার ভাল নয় এবং তাদের মধ্যে কোন সামাজিকতা নেই। আবার তিনি বাংলাদেশের চিনি, চাপা কলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

"বাবুর নামা" একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মুঘল ইতিহাস পুনর্গঠনের এর গুরুত্ব হলো অপরিসীম। ঐতিহাসিক Elliot ও Dowson বাবরের এ আত্মজীবনী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। বাবর তার এ আত্মজীবনীতে অনেক কবিতা ব্যবহার করে নিজের কাব্য প্রতিভার পরিচয় দেন। কাজেই তিনি একজন সাহিত্যিক হিসেবেও ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

গুলবদন বেগম

মুঘল ভারতের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট বাবরের মেয়ে ও সম্রাট হুমায়নের ছোট বোন গুলবদন বেগম (১৫২২-১৬০৩ খ্রি) রচিত "হুমায়ুন নামা" একট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এটি জীবন চরিত জাতীয় লেখা। এতে সম্রাট বাবর, হুমায়ুন ও সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রথম ২২ বছরের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। মূলত : আকবরের অনুরোধে তার ফুফু গুলবদন বেগম এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি যখন এ গ্রন্থ রচনা করেন তখন তার বয়স ছিল ৬৫ বছর।

"হুমায়ুন নামা" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আকবরের অনুরোধে গুলবদন বেগম ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় এ গ্রন্থটি রচনা করেন।[৫] এ গ্রন্থে শুধু হুমায়ুনের ইতিহাসই আলোচনা করা হয়নি বরং বাবর ও আকবরের ইতিহাসও আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বাবরের জীবনের নানা দিক আছে। আরো আছে হুমায়ন যখন চরম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন নিজের জীবনের বিনিময়ে বাবর পুত্রের জীবন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার ফলে আল্লাহ তা কবুল করলে বাবরের মৃত্যু হয়। এতে হুমায়ুনের শাসনকালের সফলতা, ব্যর্থতা ও রাজ্য পুনরুদ্ধারের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এতে আছে মুঘল হেরেমের প্রেম, ভালবাসা, বিবাহের কাহিনী। হেরেমের বিস্তারিত বিবরণ এতে আছে, যা অন্য কোন ঐতিহাসিকের বিবরণে নেই। হিন্দালের বিয়ে ও উৎসবের যে কাহিনী গুলবদন দিয়েছেন তা মুঘল বিয়ের উৎসবের বিস্তৃতি ছবি আমরা জানতে পারি। বাবর যখন মারা যান তখন গুলবদনের বয়স ছিল ৮ বছর। গুলবদনের লেখায় তার পিতা বাবর সম্পর্কে যা বিবরণ আছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। গুলবদনের এ লেখায় মুঘল ইতিহাসের একটি মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মুঘল হারেমের প্রেম ভালবাসা গুলবদন বেগম দিয়েছেন। হুমায়ুন যখন হামিদা বানু বেগমের প্রেমে পড়েন তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তখন হামিদা বানু বেগম ইতস্তত করেছিলেন। তখন হামিদা বানুর মা দিলদার বেগম হামিদাকে বুঝিয়ে বলেন, "শেষাবধি তুমি যে কোন একজন পুরুষ মানুষকে তো বিয়ে করবেই। অথচ বাদশাহর পানি গ্রহণে তোমার অনীহা কেন? বাদশার চাইতে বড় পাত্র তুমি কোথায় পাবে?"

---

৫. "হুমায়ুন নামা" গুলবদন বেগম (অনু. মোস্তফা হারুন) ঢাকা-১৯৮৯।

www.pathagar.com

হামিদা জবাব দিল, "ঠিকই বলেছেন, যে কোন পুরুষকে আমার বিয়ে করতেই হবে। কিন্তু সে হবে এমন পুরুষ, যাকে আমি সহজেই আমার আয়ত্তে পাব। যাকে আমি কাছে পাবনা, যার দর্শন লাভ করবার জন্য আমাকে রীতিমত সাধনা করতে হবে, সে মানুষ আমি কেন বিয়ে করব?"[৬] এভাবে ৪০ দিন ধরে নানা যুক্তি তর্কের পর হামিদা বানু বেগম সম্রাট হুমায়ুনকে বিয়ে করতে রাজি হয়। গুলবদন বেগম আরো একটি চমৎকার ঘটনার কথা বলেছেন। আর তা হলো শের শাহের সাথে যুদ্ধে হেরে হুমায়ুন যখন ঘোড়া হারিয়ে চৌসা এলাকায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নদী পার হতে যান ঠিক তখন হুমায়ুন নদীতে পড়ে যান। তখন হুমায়ুনের একজন গোলাম (ভিসতি) আলা নিজের জীবন বিপন্ন করে সম্রাট হুমায়ুনকে নদী থেকে উদ্ধার করেন। এ জন্য খুশি হয়ে হুমায়ুন এ ভিসতি আলাকে ২ দিনের জন্য রাজত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। এ ভিসতি আলার পরিচয় সম্পর্কে গুলবদন বলেন, "এই নিরীহ ভিসতি লোকটির সত্যিকার কোন পরিচয় আমি জানতাম না। তবে কেউ তার নাম বলতো নিজাম, কেউ সম্বল বলে ডাকতো।"[৭] এরকম পারিবারিক ও রাজনৈতিক অনেক ইতিহাসের কথা আমরা গুলবদনের লেখায় পাই। আরো পাই রাজ্য হারা হয়ে যখন হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করেছিলেন তখন মরুভূমির মধ্যে হামিদা বানু বেগমের গর্ভে আকবরের জন্মের ঘটনা, এ ঘটনা গুলবদন একজন দক্ষ শিল্পির মতো তুলে ধরেছেন।

"হুমায়ুন নামার" ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

সমালোচনা

বিভিন্নভাবে "হুমায়ুন নামা" গ্রন্থটি সমালোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ড. ব্যানার্জি বলেছেন যে, 'হুমায়ুন নামা' গ্রন্থের শব্দের বানান মাঝে মাঝে সঠিক হয়নি। তার গ্রন্থে সন তারিখ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। গুলবদন তার বড় ভাই হুমায়ুনের খালি প্রশংসাই করেছেন তার কোন দুর্বলতার কথা বলেননি। এ গ্রন্থে হুমায়ুনের ভাই হিন্দাল হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও তার সাথে দুর্ব্যবহার করলেও তার প্রতি হুমায়ুনের গভীর ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। হুমায়ুনের বোন হওয়ার কারণে গুলবদন বেগম অনেক ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের জীবনের এসব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তার এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুঘল ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যতম উৎস হিসেবে এর গুরুত্বকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

---

৬. *"হুমায়ুন নামা" গুলবদন বেগম (অনু-মোস্তফা হারুন) প্রাগুক্ত পৃ-৫৬-৫৭।*
৭. *"হুমায়ুন নামা" পৃ-৪৬।*

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

আবুল ফজল, নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশি আব্দুল কাদের বাদাউনী

আবুল ফজল

আবুল ফজল ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি "আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী" লিখে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার মত ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে একটিও জন্ম নেয়নি আর কখনো নিবে কিনা সন্দেহ। আবুল ফজল ছিলেন ভারতের মুঘল ইতিহাসের এক অধ্যায়।

আবুল ফজলের পরিচয়

মুঘল সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন আবুল ফজল ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী (৯৫৮ হিজরির ৬ মহররম) ভারতের আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল শেখ মোবারক। তার পিতা সম্রাট আকবরের দরবারে একজন প্রধান আমত্য ছিলেন। তার ভাই ফৈজী ছিলেন আকবরের দরবারে দরবারি কবি ও আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। তার পুরো নাম হলো আবুল ফজল আল্লামী। তিনি তার পিতার কাছেই বিদ্যা শিক্ষা শুরু করেন এবং দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সুফীতত্ত্বে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় রত হতেন। কিন্তু, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে তার মতবাদ মিলেনি। তার ভাই আকবরের সভাকবি ফৈজী ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাকে আকবরের দরবারে নিয়ে আসেন এবং সম্রাটের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেন। এখান থেকে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আবুল ফজলের সংস্পর্শে এসে সম্রাট আকবর নতুন যুগের সন্ধান পান।

তিনি উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। তিনি ৬,০০০ হাজার মসনবদারের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার ভার লাভ করেন। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ সেলিম (সম্রাট জাহাঙ্গীর) পিতা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন তারই প্ররোচনায় আবুল ফজল নিহত হন।[১]

---

১. *"আইন-ই-আকবরী" আবুল ফজল আল্লামী (অনু-আহমদ ফজলুর রহমান) ঢাকা-২০০৮।*

www.pathagar.com

আবুল ফজলের গ্রন্থসমূহ

"আকবর নামা" ছাড়াও আবুল ফযল বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তা হলো– ফার্সি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, আনওয়ার-ই-সুলাইলির সংস্করণ, ইয়ার-ই-দানিশ, তারিখ-ই-আলফীর ভূমিকা, মহাভারতের ফার্সী অনুবাদ এবং একটি মোনাজাত প্রভৃতি। তার লিখিত চিঠি পত্র ও অন্যান্য বিক্ষিপ্ত রচনা তার ভ্রাতুস্পুত্র কর্তৃক "ইনশা-ই-আবুল ফজল শিরোনামে ৩ খণ্ডে সংকলিত হয়। তার ব্যক্তিগত পত্রসমূহ "রাকআত-ই-আবুল ফজল" শিরোনামে সংকলিত হয়।

আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরীর বিষয়বস্তু

আবুল ফজল দীর্ঘ ৭ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আকবর নামা" রচনা করেন। এ গ্রন্থ ৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালের বিবরণ ও আকবরের জন্ম বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ১৫৫৬ থেকে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ সম্রাট আকবরের ৪৬ বছরের রাজত্বকালের ধারাবাহিক ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে হলো "আইন-ই-আকবরী।" অর্থাৎ এ খণ্ডকে "আকবর নামার" পরিশিষ্ঠও বলা যায়। মূলত এ খণ্ডেই আবুল ফজল তার পাণ্ডিত্বের অসাধারণ পরিচয় দেন। এ খণ্ডে তিনি সম্রাট আকবরের শাসনকালের সমস্ত কিছু যেমন– রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন তুলে ধরেন। এ সাথে বাংলায় মুসলিম শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ দেন। নিম্নে আকবর নামা গ্রন্থ চিত্রের সাহায্য দেখানো হলো :

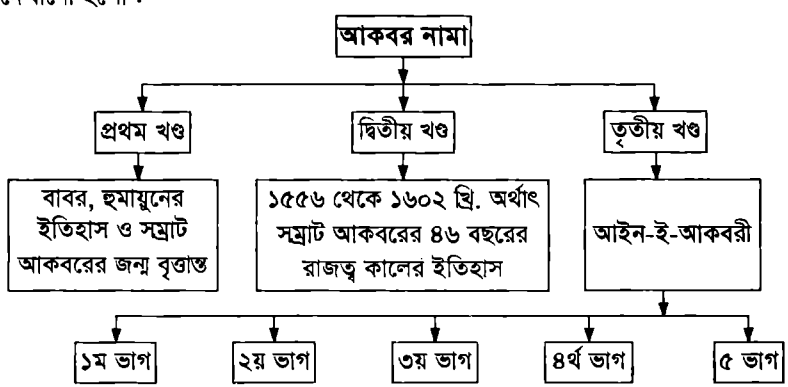

আবুল ফজলের আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে যে, সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়নের কাহিনী। এর সাথে আরো আলোচনা করা হয়েছে সম্রাট আকবরের জন্ম বিত্তান্ত। আকবরের জন্ম সম্পর্কে আবুল ফজল এক অদ্ভুত কাহিনীর অবতারণা

www.pathagar.com

করেছেন। যার সাথে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। এ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট আকবরকে খুশি করা এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, যখন হামিদা বানু বেগম (সম্রাট আকবরের মা) আকবরকে গর্ভে ধারণ করলেন তখন তার ভ্রু থেকে অদ্ভুত জ্যোতির কিরণ লক্ষ্য করা যায়। আবার আকবরের ধাত্রী মাতা (আজিজ কোকার মা) অনুভব করেছিলেন যে, একটি জ্যোর্তিময় আলো ধাবমান হয়ে তার বুকে এসে আশ্রয় নেয়। আসলে আবুল ফজল এসব অদ্ভুত কথা লিখে সম্রাটের সন্তুষ্টি লাভ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে সম্রাট আকবরের ৪৬ বছরের রাজত্বকালের ঘটনাবলি এতে বর্ণনা করা হয়। সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা আক্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এতে আছে। দাউদ খান করবানীর পতনের মাধ্যমে মুঘলদের বাংলা বিজয় হয়। যদিও পুরো বাংলা মুঘলারা দখল করতে পারেনি। কারণ ছোট ছোট জমিদাররা তাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ জমিদাররা সমষ্টিগতভাবে "বার ভূইয়া" নামে পরিচিত। এসব জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন সোনার গায়ের ঈসা খান। তিনি ছিলেন বার ভূঁইয়াদের নেতা। তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ "আইন-ই-আকবরীতে" আবুল ফজল সবচেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দেন। এখানে আকবরের প্রশাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এর সাথে তিনি বলেন যে, বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, বাংলাদেশের নাম আগে বঙ্গ ছিল, পরে আল শব্দ তাতে যুক্ত হয়, এ আল শব্দের অর্থ জল প্রতিরোধের বাঁধ। বঙ্গদেশে অনেক নিম্ন ভূমি আছে, সেখানে বাঁধ বা খাল বাঁধতে হত, সে জন্য বঙ্গ শব্দের সাথে এ "আল" শব্দ যোগ হয়ে বাঙ্গাল শব্দ নিস্পন্ন হয়েছে। এ বাঙ্গাল শেষে বাংলাতে পরিণত হয়েছে।[২] বাংলাদেশের হিন্দু শাসন আমলের একটি বিবরণ" আইন-ই আকবরীতে আছে। বখতিয়ার খলজীর বাংলা দখলের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। বাংলার সুলতানদের ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন।[৩] আরো আছে কদর খানের তরবারি বাহক ফকর-উদ-দীন মোবারক শাহের বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে। আরো আছে দিল্লির সুলতান ফিরজ শাহের বাংলা অভিযান ও বাংলার সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের কথা। ইলিয়াস শাহকে আবুল ফজল একবার

---

২. *"আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী" আবুল ফজল (অনু-পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, ঢাকা-২০০৮-পৃ.-৯৩।*

৩. *"আইন-ই-আকবরী" আবুল ফজল আল্লামী (অনু-আহমদ ফজলুর রহমানী) প্রাগুক্ত।*

www.pathagar.com

ভাদ্দারা"[৪] আরেকবার "ভাদায়াত্ত"[৫] বলেছেন। আবুল ফজল আরো উল্লেখ করেন যে বাংলার সুলতান গিয়াস উদ-দীন আযম শাহের সাথে পারশ্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের পত্র বিনিময় প্রসঙ্গে। হাফিজ সুলতানের জন্য যে কবিতা পাঠান, তাতে নিম্নরূপ শ্লোকটি ছিল: এখন ভারতের টিয়া পাখিসমূহ চিনি নিয়ে আনন্যোৎসব করতে এই সুমিষ্ট ফারসি কবিতায় তা এতদূর বাংলাদেশে বহন করে নিয়েছে।

আবুল ফজল ৬৬ ধরনের মনসবদারের কথা বলেছেন। বিভিন্ন মনসবদারের বেতন ছিল ৬০,০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন মনসবদারের বেতন ছিল ১০০ টাকা। মনসবদারদের বিভিন্ন নামের কথাও বলেছেন। যেমন– দশ হাজারী, আট হাজারী, সাত হাজারী, প্রভৃতি। এসব মনসবদারের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও দিয়েছেন। মুঘল সম্রাট আকবর "দ্বীন-ই-ইলাহী" ধর্মমত প্রবর্তন করেন যে তারই পরামর্শে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। "দ্বীন-ই-ইলাহী" ধর্মমতের মূলনীতিগুলো তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন। আবুল ফজল তার "আকবর নামা" ও "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থ রচনায় সরকারি উৎস ব্যবহার করেছেন।

তিনি তার গ্রন্থটি ৭ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রচনা করেন এবং এ গ্রন্থের খসড়া ৫ বার সংশোধন করেছেন।

তিনি দিল্লী রাজাদের ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে বলেন যে মহা প্রতাপশালী কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র তার রাজ্যভিষেকের সময় প্রায় সমস্ত জায়গা থেকে রাজাগন এসে তাকে অভিনন্দন জানাল। শুধু দিল্লীর রাজা পৃথিরাজ চৌহান এ সভায় উপস্থিত হয়নি। তাই জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের একটি স্বর্ণ মূর্তী নির্মাণ করে রাজ প্রাসাদের দরজার কাছে স্থাপন করে তাকে চরম অপমান করবার আশায়। এদিকে ছদ্মবেশে ৫০০ বাছাই করা যোদ্ধা নিয়ে পৃথ্বিরাজ জয়জন্দ্রের রাজ প্রাসাদের দরজা থেকে নিজের স্বর্ণ মূর্তী ছিনতাই করে নিয়ে দিল্লীতে ফিরে যান। এ খবর শুনে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের প্রেমে পড়ে যান। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, পৃথ্বিরাজ ছাড়া আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না। কন্যার এ কথা শুনে রাজা জয়চন্দ্র খুবই রাগান্বিত হন এবং কন্যাকে বন্দি করেন। এ খবরে পৃথ্বিরাজ তার গায়ক বন্ধু চাঁদকবি বা চন্দর সাথে ছদ্মবেশে জয়চন্দ্রের সভায় গান গাইতে গেলেন। পৃথ্বিরাজের সাথে ছিল ১০০ জন ছদ্মবেশধারী যোদ্ধা। সেখানে জয়চন্দ্রের সাথে ভীষণ যুদ্ধের পর পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্রের কন্যাকে দিল্লী নিয়ে যান। এর প্রতিশোধ হিসেবে জয়চন্দ্র মোহাম্মদ ঘুরির সাথে যোগদান করে মোহাম্মদ ঘুরিকে দিল্লী দখল করতে সাহায্য করেন।

---

৪. "আইন-ই-আকবরী" ঐ পূর্বক্ত পৃ.-৯১।

৫. ঐ পৃ.-৯৫।

www.pathagar.com

আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের উৎস

আবুল ফজল তাঁর আই-ই-আকবরী গ্রন্থের নিম্নলিখিত উৎসগুলো ব্যবহার করেন।

(ক) আবুল ফজলের "আকবর নামা" গ্রন্থের নায়ক হলেন মুঘল সম্রাট আকবর সম্রাটের কাছ থেকে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ তার এ গ্রন্থ রচনার অন্যতম উৎস।

(খ) মুঘল সম্রাট আকবরের পিতা হুমায়ুন একটি বিশাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। আর আকবর এ লাইব্রেরীর আরো সম্প্রসারণ করেন। এ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গ্রন্থ থেকে আবুল ফজল যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেন।

(গ) বিভিন্ন সরকারি দলিল পত্রাদি, যে কোন চুক্তিসমূহ বিভিন্ন সরকারি ফরমানসমূহ সৈন্য বাহিনীতে বিভিন্ন নিয়োগ মনসবদারদের নিয়োগের আদেশসমূহ আবুল ফজল এ গ্রন্থ রচনা উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

(ঘ) মুঘল দরবারের বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে আবুল ফজল তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আকবর নামার" উৎস সংগ্রহ করেন।

(ঙ) কোন ঘটনা কোন সময়ে ঘটেছে, তার প্রেক্ষাপট কি? এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিয়ে তিনি তার গ্রন্থ রচনা করেন।

(চ) জুমআ নামাজে সম্রাট আকবর খুতবা থেকেও আবুল ফজল তার গ্রন্থের তথ্য নিয়েছেন।

(ছ) মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠার পর এখানে সমস্ত তথ্য রাখা হয়। এ মহাফেজখানা থেকে আবুল ফজল তথ্য সংগ্রহ করে তার বই রচনা করেন।

(জ) আবুল ফজলের নিজ পরিবার ছিল তার "আকবরনামা" গ্রন্থ রচনার সবচেয়ে বড় উৎস। কারণ তার পিতা শেখ মোবারক ছিলেন সম্রাট আকবরের গৃহশিক্ষক ও দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি। আবুল ফজলের ভাই ফৈজী ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের বাল্য বন্ধু ও সভাকবি। তাদের কাছ থেকে আবুল ফজল তথ্য সংগ্রহ করে তার এ বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

(ঝ) মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি তার গ্রন্থ রচনা করেন।

(ঞ) বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ থেকে আগত বিভিন্ন মিশানারীদের কাছ থেকে আবুল ফজল তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেসুইট পাদ্রীদের কাছ থেকে এবং ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশানারীদেরে কাছ থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন।

www.pathagar.com

(ট) আবুল ফজল প্রজাদের কাছ থেকে সম্রাট আকবর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার গ্রন্থ লিখেন।

(ঠ) এছাড়া তিনি লোকমুখে সম্রাটের রাজত্বকাল সম্পর্কে শোনা কথা, কাহিনী তার গ্রন্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন।

সমালোচনা

আবুল ফজলের এ বিখ্যাত গ্রন্থটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন–

১. আবুল ফজল গ্রন্থ রচনায় ভারতীয় রীতি পরিহার করে মোঙ্গলরীতি-অবলম্বনে লিখেছেন।

২. তিনি তার গ্রন্থে অলঙ্কার যুক্ত ভাষা ও জটিল ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

৩. আবুল ফজল অনেক ক্ষেত্রে সত্য গোপন করেছেন।

৪. তিনি সম্রাট আকবরকে তোষামোদ করতে গিয়ে তার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেননি। তিনি সম্রাট আকবরের প্রতিপক্ষের কৃতিত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

৫. তিনি তৈমুর লংয়ের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্পর্কে বলেছেন কিন্তু ভারতে তিনি যে ধ্বংসলীলা চালান সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিরব থেকেছেন।

৬. তিনি শেরশাহকে আফগান বিদ্রোহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৭. আবুল ফজলের সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ছিল সম্রাট আকবরের প্রতি অন্ধ ভক্তি। আকবরকে আদর্শ শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার লক্ষ্য।

৭. ঐতিহাসিক ইলিয়ট ও ডাউসন বলেন যে, আবুল ফজলের গ্রন্থে আকবরের প্রশংসাই অধিক করা হয়েছে। আর ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজ বলেছেন, "His style is obscure and that he was a shameless flatterer" অর্থাৎ "তার প্রকাশভঙ্গী বা রচনাশৈলী অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য এবং তিনি ছিলেন নিলজ্জ চাটুকার"। ঐতিহাসিক বাদাউনীও আকবরের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির জন্য তাকে পছন্দ করেননি।

মূল্যায়ন

অনেক দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আবুল ফযলের "আকবর নামা" ও 'আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থ যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। এটি ছিল মুঘল ইতিহাসের অন্যতম উৎস। ড. এস. কে ব্যানার্জি বলেন, "Abul Fazal was the most gifted. He possessed a sound historical imagination which he brought into play while wirting the Akbarnamah and thus throws considerable light on

www.pathagar.com

Mughal culture and military strength." অর্থাৎ "তিনি (আবুল ফজল) আকবর নামা রচনায় ঐতিহাসিক হিসেবে দক্ষতার ও কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং মুঘল কালচার ও সামরিক শক্তির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।" ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন-অন্যতম। যদিও তিনি সম্রাট আকবরকে তার গ্রন্থে খুবই বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন তারপরও তিনি যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। মুঘলদের চরম শত্রু হিমু ও শের শাহের প্রশংসা করতে তিনি মোটেও ভুল করেননি।

আবুল ফজল তার "আকবর নামা" ও "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থ রচনা করে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে। তার এ গ্রন্থ ভারতবর্ষে মুঘল ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড় উৎস। যদিও তিনি ছিলেন দরবার ঐতিহাসিক তার পরও তিনি নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বার্থক ঐতিহাসিক।

নিজাম-উদ-দীন আহমদ বকশী

ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখসী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন মহান মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "তবাকাত-ই-আকবরী" লিখে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক ড. এস. কে. ব্যানার্জির মতে, ভারতে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থাবলির মধ্যে 'তবকাত-ই-আকবরী" বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

পরিচয়

খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশী ছিলেন হিরাতের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তার পিতার নাম ছিল আহমদ খাজা মুকিম। তার পিতা সম্রাট বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের অধীনে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমদ বকশী একজন সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সে সময়ের পণ্ডিত ব্যক্তি মোল্লা আলী শেরের ছাত্র। তিনি ব্যক্তি জীবনে একজন সৈনিক ও প্রশাসক হিসাবে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আকবর তাকে গুজরাটের বখশীর পদে নিয়োগ দেন। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট আকবর তাকে ১৫৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে মীর বখশীর পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি সরকারি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেও তিনি ইতিহাসচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

"তবকাত-ই-আকবরী" গ্রন্থের বিষয়বস্তু :

নিযাম-উদ-দীন আহমদ বখশীর "তবকাত-ই-আকবরী" গ্রন্থটি মোট ৯টি অধ্যায় বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায় : দিল্লিতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা মোহাম্মদ ঘুরির সময় থেকে মহামতি আকবরের শাসনের ৩৭ বছরের ইতিহাস এতে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : এতে আলোচিত হয়েছে দাক্ষিণাত্যে বাহামনী শাসনের ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : গুজরাটের শাসকদের ইতিহাস (১৩৯০ – ১৫৭২ খ্রি.) অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রি. সম্রাট আকবরের গুজরাট দখল করবার সময় পর্যন্ত।

চতুর্থ অধ্যায় : মালবের ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাস, ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর কর্তৃক দাউদ খান করবানীর পতন পর্যন্ত এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জৌনপুরের সারকী বংশ (১৩৮২ – ১৪৭৬ খ্রি.) পর্যন্ত। অর্থাৎ দিল্লির সুলতান বাহলুল লোদীর কাছে হোসেনের পরাজয় পর্যন্ত।

সপ্তম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে কাশ্মীরের মুসলিম শাসন (১৩১৫ – ১৫৮৪ খ্রি.) পর্যন্ত অর্থাৎ আকবরের কাছে ইউসুফ শাহের বশ্যতা স্বীকার পর্যন্ত।

অষ্টম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সিন্ধুর ইতিহাস (৭০৫ – ১৫৯০ খ্রি.) পর্যন্ত।

নবম অধ্যায় : শায়খ ইউসুফের (মুলতান) রাজত্বকালের ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুঘল বিজয় পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

উপসংহারে আকবরের সাম্রাজ্যের আয়তন, নগর ও গ্রামের সংখ্যা, রাজত্বের পরিমাণ আলোচিত হয়েছে। সে সাথে উপমহাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

সমালোচনা

১. ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এ গ্রন্থকে "Dry, colourless chronicle of external events" অর্থাৎ নীরস, "শুষ্ক কাহিনীর ইতিবৃত্ত" বলেছেন।

২. সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর সম্পর্কে এ গ্রন্থে কিছুই আলোচনা করা হয়নি। ড. কোরাইশীর মতে, নিযাম-উদ-দীন দ্বীন-ই-ইলাহী সম্বন্ধে নীরবতার কারণ ছিল এই যে, ধার্মীক মুসলমান হিসেবে তিনি তা পছন্দ করেননি। সে সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেননি।

৩. ড. ব্যানার্জির মতে, মাঝে মাঝে তিনি কথা গোপন করেছেন। মালবের রায় বাহাদুর সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেও আকবরের হাতে তার পরাজয় ও কারাবরণের কথা বলেননি।

৪. সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশায় তিনি তার গ্রন্থের নামের সাথে সম্রাটের নামও লিখেছেন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও "তবকাত-ই-আকবরীর" গুরুত্বকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। ঐতিহাসিক ফিরিশতা উল্লেখ করেন যে, যতগুলো ইতিহাস গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন তার মধ্যে "তবকাত-ই-আকবরীতে" তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন।

আবদুল কাদের বাদাউনী

ভারতে মুসলিম ইতিহাসচর্চা মুঘল আমলে স্বর্ণ যুগের সূচনা করে। মুঘল আমলের অন্যতম ঐতিহাসিক ছিলেন আবদুল কাদের বাদাউনী। তিনি 'মুনতাখাব-আল-তাওয়ারিখ" নামে ৩ খণ্ডের একটি গ্রন্থ লিখে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রাজদরবারে চাকরি করেও তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের একজন বড় সমালোচক।

পরিচয়

তিনি ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে রোহিলা খণ্ডের বাদাউন শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হলো শায়খ মুলুক শাহ। তিনি ফৈজী ও আবুল ফজলের সাথে শেখ মোবারকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সে সময়ের প্রখ্যাত জ্ঞানি ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও প্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তার সাথে ১৫৭৩ বা ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের দেখা হয় এবং সম্রাট তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে দরবারের ইমাম পদ দান করেন। সম্রাট আকবর যখন দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রবর্তন করেন তখন তিনি আকবরের একজন ঘোর সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই তার গ্রন্থটি আকবরের সময়ে প্রকাশিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তার এ গ্রন্থ "মুনতাখাব আল-তাওয়ারিখ" প্রকাশিত হয়। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বদাউনীর রচনাবলি

তার অনুদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল মুজামুল বুলদান, নাজাতুন রশিদী এবং রামায়ন। তিনি হাদিসগ্রন্থের সংকলন করেন যার নাম ছিল "বাহারুল আছমার" এবং তার বন্ধু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিযাম-উদ-দীন আহমদ বখশীর পরামর্শে" নাজাত-উর-রশিদ" নামে ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবিদ্যার উপর গ্রন্থ লিখেন। এছাড়াও তিনি ইতিহাস ও মহাভারতের অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে দুটি অধ্যায়ের পূর্ণ অনুবাদ করেন।

www.pathagar.com

মুনতাখাব-আল-তাওয়ারিখের বিষয়বস্তু

বদাউনীর "মুনতাখাব-আল-তাওয়ারিখ ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ডে গজনীর বংশ থেকে শুরু করে দিল্লির মুসলিম শাসনের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্রাট আকবরের পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে এ খণ্ডে পুরোটাই সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল নিয়ে রচিত।

তৃতীয় খণ্ডে আকবরের সময়ে ৭০ জন সুফী, দরবেশ ও দার্শনিক, ১৫ জন চিকিৎসক ও ১৬৮ জন কবির আলোচনা আছে।

মূল্যায়ন

বদাউনীর গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডটি সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ এ খণ্ডে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে পুরোটা আলোচনা করা হয়েছে। সম্রাটের ধর্ম নীতি পরিবর্তনের কারণে তিনি সম্রাটের একজন বড় সমালোচক হয়ে উঠেন। সে কারনে তার গ্রন্থটি আকবরের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়নি। তিনি মুঘলদের একজন একান্ত ভক্ত হয়েও আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি শেরশাহ ও তার পুত্র ইসলাম শাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছেন যে, যে বছর শের শাহের রাজত্বকালে ১৫৪০ খ্রিস্টীয় তার জন্ম হয়েছিল বলে।

বদাউনী ছিলেন আকবরের সময়ে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ড. এস. কে. ব্যানার্জির মতে, বদাউনী একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তার মতে, কলিঞ্জের বিজয় সমাপ্ত হতে দু'বছর হয়েছিল। ঐতিহাসিক ড. কোরাইশীর মতে, দ্বীন-ই-ইলাহী প্রসঙ্গে বদাউনী যা সত্য মনে করেছেন তাকে ভালভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে কিছু অতিরঞ্জন করেছেন, যা ঐতিহাসিকের সত্য নিষ্ঠার বিরুদ্ধে গিয়েছে। বদাউনী আবুল ফজলের মত চাটুকার ছিলেন না। যেখানে আবুল ফজল আকবর সম্পর্কে তোষামদ করেছেন সেখানে নিযাম-উদ-দীন আহমদ বখশী নিরবতা পালন করেছেন সেখানে বদাউনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, আব্বাস খান শেরওয়ানী

তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী

মুঘল ইতিহাসের-উৎস-হিসেবে "তুযুক-ই জাহাঙ্গীরীর" গুরুত্ব হলো অপরিসীম। এ গ্রন্থটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও মুঘল সাংস্কৃতির এক অনুপম ও বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ হলেও "তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী" মুঘল ইতিহাস পুনঃগঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে তার রাজত্বকালের প্রথম ১৯ বছরের (১৬০৫ খ্রি. – ১৬২২ খ্রি.) লিখেছেন।

১. জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ ও জন্ম সম্পর্কে

সম্রাট জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ১০১৪ হিজরী জমাদিয়স সানির ২০শে তারিখ বৃহস্পতিবার (২৪ শে অক্টোবর ১৬০৫ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার জন্ম সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তার পিতা সম্রাট আকবরের ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত কোন সন্তান জীবিত থাকেনি। তাই তিনি আগ্রার বিখ্যাত পীর শেখ সেলিম চিশতী (রহ)-এর দরবারে বসে কাঁদতেন। শেখ সেলিম সম্রাটকে জানালেন যে, তার তিনটি পুত্র হবে। সম্রাট এ কথা শুনে বলেন যে, প্রথম পুত্রের নাম আপনার নামের সাথে রাখবো। এরপর শেখ সেলিম চিশতীর দরবারে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। শেখ সেলিমের নামানুসারে সম্রাট আকবর পুত্রের নাম রাখলেন সেলিম। সম্রাট তাকে আদর করে "শেখুবাবা" বলে ডাকতেন।[১]

২. সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস

"তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী" থেকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের যুদ্ধ বিগ্রহ ও সম্রাট-কতৃক-বিদ্রোহ দমনের ঘটনাবলি জানা যায়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর ও হিমুর মধ্যে পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয় ও প্রাণনাশের ঘটনা এতে লেখা আছে। তাছাড়া ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর কর্তৃক গুজরাটের বিদ্রোহ দমনের বিস্তৃত বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে।

---

১. *"তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা)" (অনু-সুধা বসু) কোলকাতা-১৯৯৪, পৃ. ১-২।*

www.pathagar.com

৩. সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক পিতার শ্রদ্ধা নিবেদন

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুকালীন দৃশ্য ও মৃত্যু পরবর্তী পুত্র জাহাঙ্গীর কর্তৃক আগ্রা হতে তিনক্রোশ দূরে সেকেন্দ্রায় আকবরের মৃতদেহ সমাহিত করা, পিতার সমাধি সৌধ নির্মাণ এবং ৭ দিন ধরে গরিব দুঃখীদের মধ্যে অন্ন ও মিষ্টান্ন বিতরণ প্রভৃতি ঘটনাবলি এতে বর্ণিত আছে।

৪. মুঘল চিত্র শিল্পের বিকাশ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘল চিত্র শিল্পের যে চরম বিকাশ ঘটে তা তার আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর বলেন যে, তার সিংহাসন মূল্যবান মনিমুক্তা দিয়ে তৈরি ছিল যার পিছনে ব্যয় হয় ১০ কোটি আশরাফির মতো।

৫. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ১২ টি আইন প্রর্বতন করেন। তিনি ৬০টি ঘণ্টা যমুনা নদী থেকে প্রাসাদের সামনে ঝুলিয়ে রাখতেন যাতে যে কোন ফরিয়াদী সরাসরি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারের জন্য তার প্রিয়তমা স্ত্রী নূরজাহানকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। একবার এক বিধবা এসে সম্রাটের কাছে নালিস দেন যে, মুকারব খান কাম্বে বন্দরে তার কন্যাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে। এর সত্যতা সম্পর্কে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন নিশ্চিত হন এবং জানেন যে মুকারবের কারণে সেই মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে তখন সম্রাট মুকারব খানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং হতভাগিনী বিধবাকে একটি ভাতার ব্যবস্থা করেন।[২]

নিম্নে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ১২টি আইন তুলে ধরা হলো :

১. তমখা এবং মীর বহর (নদীর শুল্ক) নামে যে শুল্ক নীতি এবং আরও যেসকল করের বোঝা ছিল, আমি তা আদায়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করলাম। এই কর ও শুল্ক প্রতিটি প্রদেশের ও জেলার জাগীরদারগণ প্রবর্তন করেছিলেন নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও লাভের উদ্দেশ্যে।

২. যে সকল রাস্তায় চুরি ডাকাতি হতো, লোকালয় থেকে যে রাস্তাগুলো দূরে আমি হুকুম দিলাম যে তাদের নিকটবর্তী জায়গীরদারগণ সেইসকল পথের ধারে সরাইখানা (জনসাধারণের বিশ্রামাগার), মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও কূপ খনন করাবেন। তার ফলে সেইসব অঞ্চলে জনবসিত গড়ে উঠবে। সরাইখানাগুলোতেও মানুষ বাস করতে পারবেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান যদি খালিসা স্টেটের (জেলাশাসকের প্রত্যক্ষ অধীনের জায়গা) মধ্যে হয়, তবে তার শাসকই (মৎসদ্দী) সেই কাজগুলি নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

---

২. *"তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী (অনু-সুধা বসু) প্রাগুক্ত, (কোলকাতা) ১৯৯৪ পৃ-১২৬।*

www.pathagar.com

৩. ব্যবসায়ীদের মালপত্রের বস্তা, গাঁট তাদের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে কোন রাস্তার উপরে খোলা চলবে না।

৪. আমার সাম্রাজ্যে কেউ, সে ভিন্ন ধর্মীই হোক, আর মুসলমানই হোক, মৃত্যু মুখে পতিত হলে, তার বিষয় সম্পত্তি অর্থ সম্পদ সব তার উত্তরাধিকারীর হাতে যাবে। অপর কেহ তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকেন তাহলে পরিদর্শক ও স্বতন্ত্র অছি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হবে তার সম্পত্তি রক্ষণের জন্য এবং তার আয় যাতে আইনসংগত কাজে ব্যয়িত হয় তার সুব্যবস্থা করার জন্য। তা ব্যয় করা হবে মসজিদ নির্মাণে, সরাইখানা প্রতিষ্ঠাতে, ভাঙ্গা সেতু মেরামত, কূপ ও পুষ্করিণী খননের কাজ।

৫. আমার প্রজাগণ মদ্য অথবা তণ্ডুলসার দরবহরা কিম্বা কোন প্রকার নেশাকর উত্তেজনক ঔষধ তৈরি এবং বিক্রয়, কোনটিই করবে না।

৬. তারা (প্রজাগণ) কোন লোকের গৃহ-আবাস অধিকার করবে না।

৭. কোন লোকেরই নাসিকা ও বর্ণছেদ করে শাস্তিদানের প্রথা আমি রহিত করে দিয়েছিলাম। আমিও আল্লা প্রদত্ত শাসনাধিকারের নামে শপথ করে স্থির করলাম যে ঐরকম শাস্তি প্রদান করে আমি কারোর জীবনকে কলঙ্কিত করবো না।

৮. আমি আর একটি আদেশ জারী করলাম যে রাজকীয় জমিজমা সংক্রান্ত উচ্চকর্মচারীগণ ও জায়গীরদার গোষ্ঠীর কেহই কোন রায়তের জমি বলপূর্বক দখল করে নিজের স্বার্থে তার চাষ আবাদ করবেন না।

৯. কোন রাজস্ব কর্মচারী অথবা জায়গীরদার যে পরগণার ভারপ্রাপ্ত থাকবেন, বিনা অনুমতিতে সেখানকার অন্য কোন জাতির সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না।

১০. বড় বড় শহরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান করে রোগীদের চিকিৎসা ও আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করতে হবে। সেই বাবদে যাই-ই হোক না কেন, তা খালিস শাসন ভাণ্ডার থেকে প্রদান করা হবে।

১১. আমার পুজাপাদ পিতৃদেবের সময়কার নিয়ম অনুসারে আমিও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে প্রতি বছর আমার জন্মদিন, ১৮ই রবিয়ল-আউয়ল থেকে আমর বয়ঃক্রম অনুসারে সেই কয়দিন রাজ্যমধ্যে খাদ্যের জন্য কোন পশু প্রাণী বধ করা চলবে না। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে আরও দুদিন মাংস খাওয়া

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ হয়েছিল। একদিন হোল বৃহস্পতিবার, যেদিনটিতে আমি রাজ্যে ও সিংহাসন লাভ করেছিলাম। আর দ্বিতীয় দিনটি রবিবার। ঐ দিনটি আমার পিতৃদেবের শুভ জন্মদিবস।

১২. আমি একটি সাধারণ আদেশ দিয়েছিলাম। যে আমার পিতার আমলের কর্মচারীদের অফিস ও জায়গীর ঠিক সেইভাবেই বজায় থাকবে।

৬. বাংলার বার ভুঁইয়াদের দমনের বিবরণ

সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমনের জন্য যে অভিযান শুরু হয় তা জাহাঙ্গীরের সময়ে এসে শেষ হয়। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে বাংলার বার ভূঁইয়াদেরকে দমনের কথা লিখেছেন। বিশেষ করে খাজা ওসমান আফগান সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে" তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে" লিখেছেন।

৭. সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী'র "মাধ্যমে আমরা জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রশাসনিক অবস্থার বাস্ত ব বিবরণ দেখতে পাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরে প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রজার জমি দখল নিষিদ্ধ করেন।

৮. জাহাঙ্গীরের সিংহাসনের বর্ণনা

জাহাঙ্গীর তার সিংহাসনের বর্ণনায় বলেন যে, এ সিংহাসনের ডালি ও মনি-মানিক্য দিয়ে তৈরি করাতে ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি আশরাফির মতো। এক একটি আশরাফি ৫ মিসকাল ওজনের। সিংহাসনের গায় ও পিঠে পঞ্চাশ মন মৃগনাভি ভরে দেয়া হয়েছিল। তার মুকুটে ১২টি কোণ প্রত্যেক কোণে ১টি করে রত্ন বসানো। তার দাম ১ লক্ষ আশরাফি। মুকটটির চূড়ান্ত কেন্দ্রে একটি ৪ মিসকালের মুক্তা বসানো। তার দাম ১ লক্ষ আশরাফি। তার নানা জায়গায় বসানো ২০০ রুবি। প্রত্যেকটির দাম ২,০০০ টাকা। এছাড়া সিংহাসনের চারপাশে ৫০ গজ পরিমাণ জায়গা মূল্যবান কিংখাব ও সোনার কারুকার্য করা কার্পেট আবৃত ছিল। এছাড়া অনেক মূল্যবান সাজসজ্জা, সুগন্ধ ধূপাধার, ঝাড়বাতি, রেমাম ও হীরা, পান্না, মনি, মুক্তা, চুনী ও সোনার কারুকার্যে সজ্জিত অগণিত তরুণ দেহরক্ষী দল ইত্যাদি জাঁকজমকে বহু বিবরণ আছে তুযুকে।"

৯. আগ্রা নগরীর মনোরম বর্ণনা

মুঘল আমলে আগ্রা নগরীর মনোরম বর্ণনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুরম্য সৌধমাল্য, উদ্যান, মসজিদ, স্নানাগার ইত্যাদির সজ্জিত আগ্রা নগরটি খুবই জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী ছিল। নানা রকম ফল-ফলাদির বিবরণ জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর বলেন, "আগ্রা হলো হিন্দুস্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধ শহরগুলোর মধ্যে একটি। ওখানে যমুনা নদীর তীরে আগেকার পুরোনো একটি কেল্লা ছিল। কিন্তু আমার পিতা আমার জন্মের আগেই সেটিকে ভূমিসাৎ করে সেখানে খণ্ড খণ্ড লাল পাথর দিয়ে আর একটি নতুন কেল্লা নির্মাণ করান। সারা পৃথিবী ঘুরেও কেউ এ সৌধটির মত দ্বিতীয় আর একটি কোথাও দেখতে পাননি। এটি তৈরি করে তুলতে সময় লেগেছিল পনের-ষোল বছর। তাতে ছিল চারটি তোরণ, আর দুটি উপদ্বার। কেল্লাটি গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা, যা ছিল তৎকালীন পারস্য দেশের ১,১৫,০০০ তোমান মুদ্রা এবং তুরানী ১০,৫০০,০০০ খানী সমতুল্য। শহরে মনুষ্য বসতি নদীটির দুই তীর ধরেই পরিব্যপ্ত। পশ্চিমতীরেই বেশি সংখ্যক লোকের বাস। তার পরিধি সাত ক্রোশ। প্রস্থের দিকে তা এক ক্রোশ। নদীর ওপারে লোকলয়ের যে অংশ পূর্বদিকে বিস্তৃত তার পরিমাপ হলো আড়াই ক্রোশ, দৈর্ঘ্য এক ও প্রস্থে আধ ক্রোশ। কিন্তু এই অংশটিতে বাড়ি ঘর, সৌধ আবাসের সংখ্যা এত বেশি যে, ইরাক, খোরাশান এবং মারওয়ান নহর (ট্রানসকসিয়ানা) এই তিনটি শহরের সমস্ত ঘরবাড়ি একমাত্র করলে তবে ওদের তুল্য হতে পারে। অনেক লোক ওখানে তিনতলা, চারতলা বাড়িও তৈরি করেছেন।"

১০. সম্রাট জাহাঙ্গীরের মূল্যবান নীতি বাক্য

জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে মূল্যবান নীতি বাক্য প্রয়োগ করেন। তার মতে, দৈহিক শক্তির জন্য তিনটি সৎ কর্মের অনুশীলন প্রয়োজন। যেমন–

(ক) (১) অল্প কথা (২) অল্প আহার ও (৩) অল্প ঘুম।

(খ) সৎ স্বভাবের জন্য প্রয়োজন (১) হালাল খাদ্য (২) দয়া প্রদর্শন ও (৩) সত্যের খাতিরে স্পষ্ট ভাষণ।

১১. পুত্র স্নেহ

জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে পুত্র স্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন। যুবরাজ খসরু যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন জাহাঙ্গীর তার বিদ্রোহ দমন করে তাকে ক্ষমা করে দেন। আবার শাহজাদা খুররম (পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও জাহাঙ্গীর তাকেও ক্ষমা করে দেন। এতে তার পুত্র স্নেহের এক অনন্য নজীর পাওয়া যায়।

১২. এক অদ্ভুত নারীর বর্ণনা

জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে এক অদ্ভুত নারীর বর্ণনা দেন। আর তা হলো, "তখন এক মালির কন্যাকে আমার সামনে আনা হয়েছিল। তার মুখমণ্ডলে ছিল গোঁফ।

www.pathagar.com

আর দাড়ি দেখা গেল একখানি তলোয়ারের বাটের মত বড়। তার মুখখানি ঠিক পুরুষ মানুষের মতো। তার বক্ষ দেশ রোমশাকীর্ণ এবং স্তনহীন। তার চেহারা দেখে আমার মনে হলো যে তার কখনও সন্তান জন্মাবেনা। আমি কয়েকজন স্ত্রী লোককে বললাম তাকে অন্দরে নিয়ে পরীক্ষা করতে। সম্ভবত সে উভয় লিঙ্গ হবে। কিন্তু তারা বললেন যে, কোন রকমেই সে অন্য নারীর চেয়ে ভিন্ন নয়।"[৩]

১৩. বাবুর নামা গ্রন্থের শেষ চার অধ্যায় লেখা

সম্রাট বাবর যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তিনি তার আত্মজীবনী শেষ করে যেতে পারেননি। তার গ্রন্থের শেষ চার অধ্যায় তুর্কী ভাষায় জাহাঙ্গীর লিখে দেন বলে তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৪] জাহাঙ্গীর বলেন, "কেবল চারটি অধ্যায় (জুজ) আমি লিখেছিলাম। এই চারটি অধ্যায়ের শেষে আমি একটি করে পংক্তি তুর্কী অক্ষরে লিখেছি। তার কারণ হলো যাতে সকলে বুঝতে পারে যে, শেষ চারটি পরিচ্ছেদ আমার লেখা। তাছাড়া সকলে আরও বুঝবেন যে, আমি তুর্কী ভাষায় অজ্ঞ নই।"

১৪. সত্য নির্ভর গ্রন্থ

সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পিতামহ বাবরের মত স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী ছিলেন। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন তা তিনি স্বীকার করেছেন এবং ঐ দোষ থেকে মুক্ত হবার সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী নুরজাহানের প্রতি দুর্বল ছিলেন তাও স্বীকার করেছেন। তিনি আরো বলেছেন তার পিতা আকবর কখনো ইসলাম ধর্মচ্যুত হননি। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও খোদাকে ভুলে যাননি। সম্রাট জাহাঙ্গীর আরো বলেছেন যে তার পিতা আকবর তার গ্রন্থে নিজের নাম লিখেছেন।

মুঘল ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে "তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীর" গুরুত্ব হলো অপরিসীম। এ গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রণালীর চিত্র পাওয়া যায়। আত্মজীবনীমূলক হলেও মুঘল ইতিহাস পুনঃগঠনের অন্যতম উৎস হিসেবে এর গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

---

৩. *"তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী" পূর্বক্ত পৃ-৪১৫।*
৪. *ঐ পৃ-৮১।*

www.pathagar.com

আব্বাস খান শেরওয়ানী

পাঠান বীর শের শাহের পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত রচনা করে আব্বাস খান শেরওয়ানী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগের শের শাহের উপর লিখিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মূলত জীবন চরিত, ইতিহাস নয়।

পরিচয়

আব্বাস শেরওয়ানী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছুই জানা যায় না। তার পিতার নাম ছিল শায়খ আলী শেরওয়ানী। তার পরিবার সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো তিনি শেরশাহের পরিবারের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আব্বাস মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে ৫০০ মনসবদারের পদ পান। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি চাকরিচ্যুত হন। পরে তিনি তার এ বিখ্যাত গ্রন্থটির রচনা করে এর নাম দেন "তুহফাত-ই-আকবর শাহী।" পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি "তারিখ-ই-শেরশাহী" হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত লাভ করে। ১৫৭৯ সালের পর যে কোন সময়ে এ গ্রন্থটি আব্বাস লিখেন।

"তারিখ-ই-শেরশাহী" বিষয়বস্তু

তারিখ-ই-শেরশাহীর" মাধ্যমে আমরা শেরশাহের পূর্ণাঙ্গ জীবনী জানতে পারি। আব্বাস শেরওয়ানী গ্রন্থের শুরুতে দিল্লি বাহলুল লোদীর সময়ে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক সংকট দিয়ে শুরু করেছেন।[৫] এ গ্রন্থের মাধ্যমেই জানা যায় শের শাহের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। পরবর্তীতে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ফরিদ মুঘলদের অধীনে চাকুরি লাভ করেন। কিন্তু এক ভোজ সভায় এমন একটি মুঘলাই পদ শেরশাহ এত সুন্দরভাবে কেটে খান যে বাবর শেরশাহের এভাবে খাওয়া দেখে ভবিষ্যতবাণী করেন যে এ ব্যক্তি মুঘলদের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে। পরবর্তীতে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দিল্লিতে "শুরী বংশের প্রতিষ্ঠা" করেন। এ গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবরণ আছে। কারণ শেরশাহ বাংলায় আক্রমণ করে হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে শেরশাহের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা আছে। শের শাহের সময় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। তার সময়ে আইনের শাসন

---

৫. "শেরশাহ" আব্বাস সারওয়ানী (ভাষান্তর : সাদিয়া আফরোজ) ঢাকা-২০০৭ পৃ-০৭।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সবাই ঘরের দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পারত। ভ্রমণকারীরা রাস্তায় স্বর্ণের থলি রেখেও ঘুমাতে পারতো। শেরশাহের শাস্তির ভয়ে কোন চোর ডাকাত কোন কিছু করবার সাহস পেত না। শেরশাহের সেনাবাহিনীতে ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও ২৫,০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য। হাতির সংখ্যা ছিল ৫,০০০ হাজার। তার রাজ্য ১০,০০০ পরগনা ছিল। প্রত্যেক জেলায় প্রধান ছিল শিকদার-ই-শিকদাররান ও মুনসেফ-ই-মুনসিফান। দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তদের গরীব দুঃখীদের বিনামূল্য খাদ্য দেয়া হত। তার রাজ্য ১,৭০০ সরাই খানা, বিশ্রামাগার মসজিদ, মাদ্রাসা ছিল। শেরশাহ ১৫৪৫ খ্রি. কালিগঞ্জ দুর্গ জয় করবার জন্য যান এবং বিজয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে নিজেদের কামানের বিস্ফোরণে মারা যান।

সমালোচনা

১. এটি জীবন চরিত, ইতিহাস নয়।

২. এতে সন-তারিখের সংখ্যা খুবই কম।

৩. এ গ্রন্থের প্রকাশ ভঙ্গি অত্যন্ত জটিল।

৪. এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে শোনা কথা অনুসারে।

বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের গুরুত্বকে আমরা কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। তিনি শেরশাহের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেছেন। শেরশাহের একজন পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার হিসেবে আব্বাস শেরওয়ানী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মীর্যা নাথান, আবুল কাশিম

মীর্যা নাথান

মুঘল আমল ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার স্বর্ণ যুগ। এ যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক ছিলেন মীর্জা নাথান। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করার জন্য সুবাদার ইসলাম খানকে পাঠান। মীর্জা নাথান ছিলেন মুঘল বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "বাহারীস্তান-ই-গায়বী" রচনা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা বাংলার এক নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারি। প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চায় তার গ্রন্থটি চির অমর হয়ে আছে।

পরিচয়

মীর্জা নাথানের নাম ছিল আলা-উদ-দীন ইস্পাহানী। মীর্জা নাথান ছিল তার ছদ্ম নাম। তার পিতার নাম হলো মালিক আলী (উপাধী ইতিমাম খান)। তার পিতা সম্রাট আকবরের অধীনে চাকরি করেন এবং ২৫০ মনসবের অধিকারী ছিলেন। বাংলার বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করবার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭খ্রি.) ইসলাম খানকে সুবেদার করে বাংলায় পাঠায়। মির্জা নাথান তার পিতার সাথে মুঘল সেনাপতি হিসেবে বাংলায় আসেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। শাহজাদা শাহজাহান যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন তিনি শাহজাহানের দলে যোগদান করেন।

"বাহারীস্তান-ই-গায়বী" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

"বাহারীস্তান-ই-গায়বী" গ্রন্থে ১৬০৮ – ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে সুবেদার ইসলাম খানের বাংলায় আগমন থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত।[১] এ গ্রন্থে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার সন্ধান আমরা পাই তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্য, সোনার খাঁয়ের জমিদার মুসা খান ও খাজা ওসমান আফগান সম্পর্কে। এ তথ্যগুলো হলো নতুন, তথ্যবহুল যা ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সন্ধান দিয়েছে। মির্জা নাথান উল্লেখ করেন যে, যখন সুবেদার ইসলাম খান

---

১. *"বাহারীস্তান-ই-গায়বী" মির্জা নাথান (অনু-খালেকদাদ চৌধুরী) ঢাকা-২০০৪।*

www.pathagar.com

বাংলায় আসেন তখন সবার প্রথমে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য তার ছোট ছেলে সংগ্রামাদিত্যকে সাথে নিয়ে বহু উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের কাছে আসেন এবং তিনি মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। মির্জা নাথান উল্লেখ করেন যে, বাংলার বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল সোনার গায়ের মুসা খান ও খাজা ওসমান আফগান। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ মির্জা নাথান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন। সুবেদার ইসলাম খার মৃত্যু সম্পর্কে মির্জা নাথান বলেন যে, যখন ভাওয়ালে ইসলাম খানের অবস্থা খারাপ হতে থাকে তখন একজন হেকিম সুবেদারের ভুল চিকিৎসা করেন। সুবেদার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে হেকিম শক্তিবর্ধক ঔষধ না দিয়ে বোকার মত চন্দনের প্রলেপ মালিশ করেন এবং প্রচুর গোলাপ জল তার গায়ে ছিটিয়ে দেন। এর ফলে সুবেদার ইসলাম খার মৃত্যু হয়। পরে তার লাশ জাহাঙ্গীর নগরস্থ (ঢাকা) "বাগ-ই-শাহী" উদ্যানে আনা হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে মির্জা নাথান আলোচনা করেছেন সুবেদার সেলিম খান চিশতীর (১৬১৩ – ১৬১৭ খ্রি) আমলের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানের ভাই-বাংলার সুবেদার ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গের ইতিহাস। তার সময়ে বাংলায় মুঘল শাসন সুদৃঢ়করণের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সুবেদার কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য জয় ও উপকূলীয় অঞ্চলে অত্যাচারী আরাকানী মগদের বিতাড়ণের ইতিহাস এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের বিদ্রোহ ও বাংলা দখলের কথা এবং বাংলা থেকে দাক্ষিণাত্য ফিরে যাবার কথা।

মির্জা নাথান বাংলার বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক পরিচিতি তুলে ধরেন। এর সাথে বিচ্ছিন্ন নদ-নদীর বিবরণ দেন। তিনি মুঘল আমলে বাংলার সপ্তদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দুই ঈদের উৎসব, মহররমের উৎসব, শবে বরাত, শবে কদরের উৎসবের কথা বলেছেন। তিনি তার গ্রন্থে ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন।

মূল্যায়ন

মির্জা নাথানের লেখা "বাহারিস্তান-ই-গায়বী" গ্রন্থ বাংলার ইতিহাস রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তিনি ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কোন কথাই গোপন রাখেন নি। তিনি তার চরিত্রের অনেক গোপন কথাও তার গ্রন্থে বলেছেন। তিনি তার সামরিক বিজয়ের কথা যেমন ফলাও করে বলেছেন আবার তার পরাজয়ের কথাও গোপন করেননি। তার চরিত্রের অনেক গোপন কথাও তিনি বলেছেন, তিনি তার প্রেমের কাহিনী বলেছেন। আবার সে সাথে অর্থের লোভে যশোহরের প্রজাদের উপর তিনি তার অত্যাচারের কথাও বলেছেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। মুঘল ছাউনীতে ঈদসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব কতো ধুমধামের সাথে পালন করা হয় তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস নির্ধারণে তার এ গ্রন্থ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক পরিচিতি তুলে ধরেছেন। একজন নৌ-সেনাপতি হিসেবে তিনি পদ্মা, করতোয়া, ইছামতি, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার তিনি তার গ্রন্থে ডাকছড়া, খিজিরপুর, ডেমরাখাল, ধলেশ্বরী, বন্দরখানা প্রভৃতির সামরিক গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলার এ কৌশলগত স্থান ও নদী পথের সন্ধান দিয়েছেন।

"বাহারিস্তান-ই-গায়বী" রচনা করে মির্জা নাথান ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার এ গ্রন্থ বাংলার ইতিহাস পুনঃগঠনের অন্যতম উৎস। বাংলার বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস তাদের দমনের ইতিহাস জানতে হলে এ গ্রন্থের গুরুত্ব হলো অপরিসীম।

আবুল কাশিম ফিরিশতা

মুঘল আমলে প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে সব ঐতিহাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন তাদের মধ্যে ফিরিশতা ছিলেন অন্যতম। তিনি "তারিখ-ই-ফিরিশতা" রচনা করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

পরিচয়

আবুল কাশিম ফিরিশতা ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ইরানের অস্ট্রাবাদ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল গোলাম আলী হিন্দু শাহ। জীবিকার সন্ধানে তার পিতা ভারতের দাক্ষিনাত্যে আহমদ নগরে এসে উপস্থিত হন। এখানে আহমদ নগরের সুলতান কর্তৃক তার পিতা রাজকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আহমদ নগরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হবার কারণে এবং তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিজাপুরে যান এবং সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহীমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিলের নামে তার গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। প্রথমে গ্রন্থের নাম দেন "গুলশান-ই-ইব্রাহীমী।" পরে এর নাম দেন "নওরুসনামা। কিন্তু পরে এটি "তারিক-ই-ফিরিশতা" নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি খুব সম্ভবতও ১৬২১ বা ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

"তারিখ-ই-ফিরিশতার"– বিষয়বস্তু

ফিরিশতা তার এ বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করবার আগে ৩৫টি গ্রন্থ পড়েন। তার এ গ্রন্থটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে মোট ১২ টি অধ্যায় আছে। ভূমিকায় ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গজনী লাহোরের সুলতানদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিল্লির সুলতানদের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দাক্ষিনাত্যের সুলতানদের, চতুর্থ অধ্যায়ে গুজরাটের সুলতানদের সম্পর্কে, পঞ্চম অধ্যায়ে মালাবের সুলতানদের, ষষ্ঠ অধ্যায়ে খান্দেশের সুলতানাদের, সপ্তম অধ্যায়ে বাংলা ও বিহারের সুলতানদের সম্পর্কে, অষ্টম অধ্যায়ে-সিন্ধুর শাসকদের সম্পর্কে, নবম অধ্যায়ে কাশ্মীরের শাসকদের দশম অধ্যায়ে মালাবারের শাসকদের সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ে ভারতের সুফী দরবেশদের সম্পর্কে ও দ্বাদশ অধ্যায়ে– ভারতের আবহাওয়া ও ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

ড. ব্যানার্জির মতে, "তারিখ-ই-ফিরিশতা" একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস (দাক্ষিণাত্যের) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কোন শাসকের তোষামোদ করেননি। ড. এ. বি. এম হবিবুল্লাহর মতে, কোথাও কোথাও তার বক্তব্য ভুল থাকলেও মোটের উপর তার লেখা নির্ভরযোগ্য। তার লেখায় ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মুগ্ধ হয়েছেন। তবে তিনি তার বইয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এ ভুল তথ্য দেন। যেমন– তিনি মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের কারাচিল অভিযানকে বলেন যে চীন অভিযান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফিরিশতা আরো বর্ণনা করেন যে, বখতিয়ার খলজী লক্ষনাবতী, দেবকোট ছাড়াও রংপুরে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। এর সত্যতা মিলে বখতিয়ার খলজীর অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রাচীন রংপুর শহরের মাহীগঞ্জে, যার কিছু নিদর্শন আজও আছে। রংপুরের কাছে যে বখতিয়ারপুর গ্রাম আছে তা মনে করা হয় বখতিয়ার খলজীর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়। তিনি দিল্লির সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের অনেক জনহিতকর কার্যাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি গিয়াস উদ্দীন বলবন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তবে তার লেখায় রাজনৈতিক ঘটনাবলির সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি ও এসেছে।

ফিরিশতার লেখায় অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস লেখার ধারাকে অনুসরণ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস দেখা যায়। তিনি মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনের উপর কিছুই লিখেননি। দিল্লির সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলকের সময় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কথা তিনি বলেছেন। সেই সাথে ফিরিশতা মোঙ্গল আক্রমণের ফলে ভারতে আসা যেসব বহিরাগত পণ্ডিত ব্যক্তি এসে আশ্রয় নেয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ বহিরাগত ব্যক্তিদের যে ১৫টি উপনিবেশ (গ্রাম) গড়ে ওঠেছিল তার নাম তিনি দিয়েছিল। আর তা হলো :

(১) মহল্লা আব্বাসী, (২) গানজারী (মহল্লা), (৩) মহল্লা মাওয়ারিযম শাহী, (৪) মহল্লা দাইনামী, (৫) মহল্লা আলুভী, (৬) মহল্লা আতাবাকী, (৭) মহল্লা ঘোরী, (৮) মহল্লা চিংগিথি, (৯) মহল্লা রুমি, (১০) মহল্লা সাংকারি, (১১) মহল্লা হয়েমেনী, (১২) মহল্লা মসুল্লা, (১৩) মহল্লা কাসাগাড়ী, (১৪) মহল্লা সমরখন্দী ও (১৫) মহল্লা খাতুই।

ফিরিশতা দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন। এটি তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকেই দিয়েছেন।

ফিরিশতা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনা করেন। তিনি কোন সুলতানের তোষামোদ করেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভুল তথ্য দিলেও তার গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য হলো অপরিসীম।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক ইতিহাসচর্চা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় প্রথম

গোলাম হোসেন সলিম

মুসলিম বাংলার ইতিহাসে অন্যতম উৎস হিসেবে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম রচিত "রিয়াজ উস-সালাতীনের" গুরুত্ব হলো অপরসীম। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি হলো বাংলার ইতিহাস রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম ইতিহাস পুনঃগঠনে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে তার মধ্যে "রিয়াজ-উস-সালাতীন" হলো অন্যতম। সম্রাট আকবরের সময় হতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসচর্চার শুরু হয় এবং এ সময়ে কেন্দ্র ছাড়াও প্রদেশসমূহের ইতিহাসচর্চার বিকাশ ঘটে। বাংলার নবাবী আমলেও এ ইতিহাসচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কোন উৎসেই পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায় নি। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালদহের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট মি., জর্জ উডনীর অধীনে পোষ্ট মাস্টার গোলাম হোসেন সলিম মুসলিম বাংলার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন তার বিখ্যাত "রিয়াজ-উস-সালাতীন" নামক গ্রন্থে। তাই বাংলার ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসেবে গোলাম হোসেন সলিম রচিত "রিয়াজ-উস-সালাতীনের" গুরুত্ব হলো অপরিসীম।

পরিচয়

গোলাম হোসেন সলিম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কোন কিছুই জানা যায় না। তিনি শুধু তার গ্রন্থে নিজের নাম ও উপাধী উল্লেখ করেছেন। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ মুনশী এলাহী বখশ তার "খুরশিদ-ই-জাহান নামায়" তার সম্পর্কে অল্প তথ্য দিয়েছেন। তার মতে, গোলাম হোসেন অযোধ্যার জইদপুরীর অধিবাসী। তার উপাধী সেলিম এবং তার স্থানের নামানুসারে তাকে জইদপুরী বলা হয়। তিনি জীবিকার খোঁজে বাংলার মালদহে আসেন এবং মালদহের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর কর্মাশিয়াল রেসিডেন্ট মি. উডনীর অধীনে ডাক মুন্সি বা পোষ্ট মাস্টারের চাকরি পান। মি. উডনীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার কাজে হাত দেন। দুই বছর পর ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে তার এ লেখা সমাপ্ত করেন। তিনি মালদহে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে। তার লেখায় ইংরেজদের গুণকীর্তন ছাড়া কোন খারাপ দিক ছিল বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

"রিয়াজ-উস-সালাতীন" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার বিখ্যাত "রিয়াজ-উস-সালাতীন" নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন।

১. হযরত নূহ (আ)-এর পৌত্র বঙ্গ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার গ্রন্থে বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এক বিস্ময়কর তথ্য দেন। আর তা হলো : হযরত নূহ (আ)-এর পৌত্র বঙ্গ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়। কারণ নূহ (আ)-এর সময়ে মহাপ্লাবনের পর নূহ (আ)-এর নির্দেশে তার পুত্ররা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। যে যে জায়গায় যায় সে জায়গা তার নামানুসারেই হয়। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর বড় পুত্র হিন্দ হিন্দুস্তানে আসলে তার নাম হয় হিন্দুস্তান। অন্য পুত্র সিন্ধ সিন্ধু আসলে তার নামানুসারে এর নাম হয় সিন্ধু। ঠিক সে রকম নূহ (আ)-এর পৌত্র হিন্দ-এর পুত্র বঙ্গ বাংলায় আসলে বঙ্গ থেকে বাংলা নামের উৎপত্তি হয়।[১] নিম্নে হযরত নূহ বংশ তালিকা দেয়া হলো :

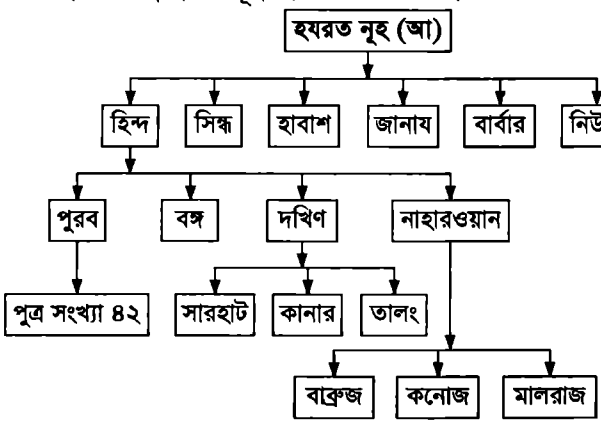

গোলাম হোসেন সলিম বলেন, "হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ)-এর সন্তানেরা বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিতে বাংলার নাম ছিল বং। এর সঙ্গে "আল" শব্দ যোগ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই, বাংলা ভাষায় "আল 'অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদি জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে বাঁধ দেওয়া হত। প্রাচীন কালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উচু, কুড়ি হাত চওড়া স্তুপ তৈরি করে তার ওপর বাড়ি, চাষাবাদ করতেন লোকে এগুলোকে বলত 'বাঙালা।"[২]

---

১. *"বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীন" গোলাম হোসেন সলিম (অনু আকবর উদ্দীন) ঢাকা-২০০৮।*

২. *"বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীন)" গোলাম হোসেন সলিম (অনু. আকবর উদ্দীন) প্রাগুক্ত পৃ. চব্বিশ)।*

www.pathagar.com

২. রাজনৈতিক দিক

"রিয়াজ-উস-সালাতীনে" বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় হতে শুরু করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে বখতিয়ার খলজীর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গোলাম হোসেন সলিম তার গ্রন্থে সর্বপ্রথম বলেন যে বখতিয়ার নদীয়া বিজয়ের পর "সুলতান কুতুবউদ্দীনের নামে টাকশালে মুদ্রা তৈরি করেন।"[৩] এরপর বখতির খলজীর হত্যার পর আলী মর্দান খলজী, শিরান খলজী, গিয়াস-উদ-দীন ইওয়াজ খলজীর রাজত্বকাল আলোচিত হয়েছে। এর পর দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশের কাছে ইওয়াজের (১২১৩ – ১২২৭ খ্রি.) পরাজয় ও মৃত্যুর কথা এবং তার পর দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার ইতিহাস, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের রাজত্বকালে বাংলার শাসনকর্তা তুগ্রিল খানের (১২৩৬ – ১২৪৫ খ্রি.) বিদ্রোহ, পরাজয় ও মৃত্যুর কথা আলোচিত হয়েছে। এর পর বলবনের পুত্র বুঘরা খানের এবং তার বংশের শাসনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংঘর্ষ, পলাশীর যুদ্ধ, নবাবের পরাজয় ও মৃত্যু, মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের সংঘাত, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রি.) এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ, দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য লাভ, পর্তুগীজ ও ফরাসি খ্রিস্টানদের দক্ষিণে ও বাংলায় উপস্থিতির বিবরণ আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার তার সমসাময়িক কালের ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

৩. বাংলার স্বাধীন, সার্বভৌম শাসকদের ও তাদের বংশ সম্পর্কে আলোচনা

গ্রন্থকার বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্বকালের ইতিহাস যারা বাংলার মসনদে আসীন হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ নিজেদের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন এদের মধ্যে ইলিয়াস শাহী বংশ, হোসেন শাহী বংশ রাজা গনেশের বংশ, হাবশী বংশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪. নাযিমদের নিজামত পরিচালনা সম্পর্কে

এছাড়াও "রিয়াজ-উস-সালাতীনে" মুঘল সম্রাটের অধীনে নাযিমদের নিজামত শাসন পরিচালনার ইতিহাস বর্ণীত আছে।

৫. ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক দিক

"রিয়াস-উস-সালাতীন" এ মধ্যযুগের বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ও পারিপার্শ্বিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা ছাড়া বাংলার পার্শ্ববর্তী কামরূপ, আসাম, ভূটান, তিব্বত, আরাকান, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশের ভূতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়।

---

৩. *"বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীন)" গোলাম হোসেন সলিম পূর্বক্ত পৃ-৪৫।*

www.pathagar.com

৬. সামাজিক দিক

গোলাম হোসেন সলিমের রচনায় মধ্যযুগে বাংলার সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বাংলার কোন কোন অঞ্চলের খাদ্য দ্রব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন গম ও বার্লি এরা খায় না। বার্লির রুটি সর্বত্র প্রচলিত না থাকলেও গমের রুটির সর্বত্র প্রচলিত আছে। তবে বাঙালি রুটির চেয়ে ভাত বেশি পছন্দ করে। তবে গোলাম হোসেনের একটি মন্তব্য সমগ্র বাংলা সম্বন্ধে সত্য নয়। হয়তো কোন বিশেষ এলাকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। গোলাম হোসেন সলিম বলেন যে বাঙালিদের ছাগল, মুরগীর গোস্ত ও ঘি সহ্য হয় না। তিনি বাংলার ফল-মূলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এসব ফল-মূলের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, আনারস, প্রভৃতি। বাঙ্গালিদের চরিত্র সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, " লেন-দেন, খরিদ-বিক্রি ও অন্যান্য সাংসারিক বিষয়ে পৃথিবীর আর কোথাও বাঙালিদের মতো দুর্নীতিপরায়ণ, ছল প্রতারক, দুর্জন দেখা যায় না। এরা ঋণ শোধ-করতে হবে বলে মনে করে না, এবং কোন কাজ একদিনে করার প্রতিশ্রুতি দিলে এক বছরেও তা করেনা।"[৪]

৭. ইউরোপীয়দের আগমন

মধ্যযুগে বাংলার যেসব ইউরোপীয় জাতি বাংলায় আগমন করে তাদের আলোচনাও "রিয়াজ-উস-সালাতীনে" স্থান পেয়েছে। এসব জাতির মধ্যে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

৮. বাংলার আধিপত্য নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বাংলার আধিপত্য নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয় তার বাস্তব বর্ণনা "রিয়াস-উস-সালাতীনে আছে। আরও আছে সকল প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে ইংরেজদের বাংলার ক্ষমতা দখলের কথা।

৯. বাংলার শহর বন্দর

"রিয়াজ-উস-সালাতীনের" একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মধ্যযুগের বাংলার কতিপয় শহর বন্দরের বর্ণনা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মুর্শিদাবাদ, হুগলি, সাতগাঁও, কোলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, পূর্ণিয়া।

---

৪. "বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীন)" ঐ পৃ-পঁচিশ।

www.pathagar.com

সমালোচনা

গোলাম হোসেন সলিমের "রিয়াজ-উস-সালাতীন "গ্রন্থ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। যেমন–

১. গ্রন্থকার ইংরেজদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, "কিন্তু ইংরেজ খ্রিস্টানগণ জ্ঞানী ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে সক্ষম। তাদের সৌজন্য ও সুবিবেচনার শক্তি আছে। সংকল্পের দৃঢ়তায় তারা অতুলনীয়, যুদ্ধে অথবা ভোজে তারা সর্বদা অতি-সতর্ক। প্রজাদের নিরাপত্তার জন্য সুবিচার প্রয়োগে, অত্যাচার দূরীকরণে ও দুর্বলের রক্ষায় তাদের সমকক্ষ কেউ নয়। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা তা রক্ষা করে। মিথ্যাবাদীদের নিজ সমাজে প্রবেশ করতে দেয় না। তারা উদার, বিশ্বস্ত, সহনশীল ও সততা সম্পন্ন। তারা প্রতারণা শিক্ষা করে নাই, অথবা অসাধুতার পুস্তক পাঠ করে নাই। বিশ্বাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের বিশ্বাস, আইন ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না।"[৫]

২. তিনি বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহকে "ভাংখোর," "ভাংরা" বলেছেন, যা মোটেও সত্য নয়।

৩. তিনি পক্ষপাতমূলক রচনা করেছেন। তিনি ইংরেজদের, মীরজাফর, ও পলাশীর চক্রান্তকারীদের প্রশংসা করেছেন।

৪. তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাকে অত্যাচারী, দাম্ভিক, দুর্নিতীপরায়ণ, লম্পট বলেছেন, যা মোটেও সত্য নয়।

৫. গোলাম হোসেন সলিম নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মা আমিনা বেগম ও খালা ঘষেটি বেগমের মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন যে, মীরজাফর ও মীরনের নির্দেশে তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাকির খান ঢাকায় আমিনা বেগম ও ঘষেটি বেগমকে পাঠিয়ে দিলে ঢাকার ফৌজদার জসরত খান উক্ত আদেশ বাধ্য হয়ে পালন করেন। বেগমদ্বয়কে একটি নৌকা করে ঢাকা থেকে এক ক্রোশ দূরে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু "সিয়ার-উল-মুতাখ খিরিনের" লেখক গোলাম হোসেন খান তবাতবারি অন্য রকম তথ্য দেন।

৬. তিনি বাঙালিদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন যা মোটেও সত্য নয়।

---

৫. ঐ পৃ-২০৫।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক ব্লকম্যানের মতে, "রিয়াজ-উস-সালাতীন" একটি উৎকৃষ্ট মানের বাংলার ইতিহাস। গোলাম হোসেন সলিম এ গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় লিখেন। বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানার জন্য এর গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মুসলিম আমলে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস (১২০৪ – ১৭৮৮ খ্রি.) পর্যন্ত ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সুলতানী ও মুঘল আমলে রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস জানার জন্য "রিয়াজ-উস-সালতীন" গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রি.) ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে গোলাম হোসেন সলিম বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সিরাজ উদ-দৌলা সম্পর্কে এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল বলেন, "নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি সত্য ও বিশ্বস্ত বলে দাবি করা যেতে পারে। গ্রন্থকার বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুপক্ষের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিরুদ্ধে তার শত্রু পক্ষের কাছে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।"[৬] ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল যা বলেছেন তা মোটেও সত্য নয়। কারণ গোলাম হোসেন সলিম নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে একটিও ভাল মন্তব্য করেননি। বাংলার উৎপত্তি, মুসলমানদের আগমন, শাসকদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রভৃতি এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। কাজেই বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের গুরুত্বকে আমরা কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

"রিয়াজ-উস-সালাতীনে" সর্ব প্রথম বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হয়। এর আগে কোন গ্রন্থে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি। তিনি মুদ্রা, শিলালিপি, সরকারি দলিল, সমসাময়িক গ্রন্থ এবং নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তার এ বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখেন। বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ব্লাকম্যান রিয়াজ উস-সালাতীনকে "একটি উৎকৃষ্ট মানের বাংলার ইতিহাস" বলে Royal Asiatic Society Journal-এ বার বার উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস (১২০৪ – ১৭৮৮ খ্রি.) জানতে পারি। লেখক একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি নিজেকে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি। তিনি বাঙালিদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। আবার ইংরেজদের অনেক প্রশংসা করেছেন। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের গুরুত্বকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

---

৬. "মুসলিম ইতিহাসচর্চা" ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল যশোর-২০০৬ পৃ-১৯৮।

www.pathagar.com

অধ্যায় দ্বিতীয়

গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি

গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ৩ খণ্ডে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন" রচনা করেন। মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস তার গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

পরিচয়

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল সৈয়দ হেদায়েত আলী খান। তার পিতা ছিলেন মুঘল শাহজাদা আলী গহর (পরে দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম)-এর প্রধানমন্ত্রী। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ছিলেন শিয়া। তিনি ছিলেন হযরত আলী (র)-এর পুত্র হযরত ইমাম হাসানের (র) বংশধর ও তবাতবায়ি গোত্রের অর্ন্তভুক্ত। নবাব আলীবর্দীখানের অনুরোধে তিনি ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে আসেন। তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার খালাতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জংয়ের গৃহ শিক্ষক ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব-সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে শওকত জংয়ের পতনের পর তিনি ভয়ে পুর্ণিয়া ছেড়ে বারানসীতে চলে যায়। নবাব সিরাজ উদ-দৌলা অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে পুর্ণিয়া ত্যাগ করার অনুমতি দেন। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাকে খুবই ভয় পান। তিনি ইংরেজদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তার বিখ্যাত "সিয়ার-উল্-মুতাখখিরিন" নামে ৩ খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। একটি কথাও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পক্ষে তিনি লিখেননি। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার উপর তার এত রাগের কোন

www.pathagar.com

কারন তিনি উল্লেখ করেননি। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তার কোন ক্ষতি করেছিল বলে ইতিহাসে নেই। তিনি শুধু ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার গ্রন্থে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

প্রথম খণ্ডে তিনি বাদশা আলমগীরের মৃত্যু (সম্রাট আওরঙ্গজেবের) ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। এর পর বাহাদুর শাহের সিংহাসন আরোহন, বাহাদুর শাহের মৃত্যু শাহজাদা রফীউদ-দারাজাত বাদশা ঘোষিত, ফররুখ সিয়ারের মৃত্যুর দুইটি বিভিন্ন বিবরণ, নিজামূল মূলকের প্রকাশ্য বিদ্রোহ, মারাঠাদের দিল্লি আক্রমন মারাঠাদের মালব ও গুজরাট জয়, জনৈক নিহত হাজীকে উপলক্ষে করে দিল্লিতে বিরাট রাজদ্রোহ, সমগ্র হিন্দুস্থানব্যাপী ছোঁয়াচে রোগ, বাঙ্গালায় রাষ্ট্র বিপ্লবের ভূমিকা আলীবর্দীর পরিবার ও শক্তির উৎপত্তি, আলীবর্দীর দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র মির্জা মুহাম্মদ সিরাজ উদ-দৌলার জন্ম আলীবর্দী কর্তৃক তাকে দত্তক গ্রহণ সহ বাংলার নবাব আলীবর্দী খানের রাজত্বের সমগ্র ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে।[১]

দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২] এ খণ্ড বিশাল খণ্ড। অনুবাদকের ভূমিকা বাদে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০৪। ৩৯ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা। বাংলার নবাবী আমলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নবাব সিরাজ উদ-দৌলা সম্পর্কে লেখক বিরূপ মন্তব্য করেছেন তা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। তিনি মীরজাফরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি ইংরেজদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মা আমিনা বেগম ও খালা ঘষেটি বেগমের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন যে, মীরনের নির্দেশে তাদেরকে নৌকা করে নিয়ে নদীর মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তারা মীরনকে অভিশাপ দিয়ে যায় যে, বিনা মেঘে বজ্রপাতে মিরনের মৃত্যু হবে এবং হয়েছিল তাই। আসলে তিনি সত্য কথা গোপন করে গিয়েছিলেন। গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ী ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আসল কথা গোপন করে

---

১. *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন [প্রথম খণ্ড] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি (অনু.ড.এম. আবদুল কাদের ঢাকা-১৯৭৮।*

২. *"সিয়ার-উল্-মুতাখখিরিন" সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি (অনু-আবুল কালাম-মোহাম্মদ যাকারিয়া) ঢাকা-২০০৬।*

www.pathagar.com

গিয়েছেন। তিনি বক্সারের যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলেন যে মীরকাশেমের সাথে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং সৈন্যদেরকে মীরকাশেম বেতন দিতে না পারলে সমরুসহ অনেক সৈন্য মীরকাসেমের পক্ষ ত্যাগ করে সুজা-উদ-দৌলার পক্ষে যোগদান করে। সুজা-উদ-দৌলার প্ররোচনায় সমরু তার পুরাতন প্রভুকে অর্থাৎ মীরকাশেমকে বন্দি করে নিয়ে আসেন। অবশেষে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের আগে মীরকাশেম পলায়ন করেন এবং অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা একাই বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। শেষে তিনি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি দিয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ডে হায়দারাবাদের নিজাম, মহিশুরের হায়দার আলী এবং অযোধ্যায় নবাবদের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও মারাঠা শক্তির অভ্যুদ্বয়, মারাঠাদের সাথে আহমদ শাহ আবদালী (দুররানী) সংঘর্ষ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ লেখকের সময় পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে।

সমালোচনা

"সিয়ার উল-মুতাখখিরিন" গ্রন্থ সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. তিনি ইংরেজদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

২. তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন।

৩. তিনি নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন।

৪. তিনি ইংরেজদের কুশাসন, অন্যায় অত্যাচারের কোন সমালোচনা না করে বরং নিরব থেকেছেন।

৫. তিনি তার গ্রন্থে ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অনেক ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মা আমিনা বেগম ও খালা ঘষেটি বেগমের মৃত্যু সংক্রান্ত এবং মীরনের মৃত্যু সংক্রান্ত তিনি ভুল তথ্য দেন।

৬. তিনি ইংরেজদের পক্ষে চাটুকারিতা করে নিরপেক্ষতা হারান।

অনেক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের গুরুত্বকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তিনি পক্ষপাতিত্বমূলক ইতিহাস রচনা করেন। তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার উপর অযথা দোষারোপ করেছেন। তারপরও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার

www.pathagar.com

ইতিহাস এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। ইংরেজরা এ গ্রন্থ পড়ে অনেক উপকৃত হয়। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ইংরেজদের অনেক দোষ গোপন করেন। ফার্সি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইংরেজদের কার্যকলাপের যৌক্তিকতা প্রমাণ হবার ফলে তারা আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ে। বাংলার রাজনৈতিক জীবনের উত্থান পতনের কাহিনী, বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করে এর ইংরেজী অনুবাদক M. Reymond (এম রেমন্ড) অবাক হয়ে বলেন, "A persian discourse on English Politics Strange indeed" অর্থাৎ, "ইংরেজ রাজনীতির উপর ফার্সি ভাষায় পর্যালোচনা কি অদ্ভুত"। ঐতিহাসিক মেকলে সহ বহু ইংরেজ লেখক এ গ্রন্থ থেকে তাদের লেখার মাল মসলা সংগ্রহ করেছেন, ইংরেজরা অনেক উপকৃত হয়েছেন। তার পরও বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলি পুনঃমূল্যায়নের জন্য "সিয়ার-উল-মুতাখখিরিনের" ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

www.pathagar.com

অধ্যায় তৃতীয়
মুনশী সলিমউল্লাহ

বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় মুনশী সলিমউল্লাহর "তারিখ-ই-বাংলা" একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তিনি বাংলার ৬ জন সুবেদারের ৬০ বছরের ইতিহাস লিখেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সরকারি দলিল পত্র ব্যবহার করে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

পরিচয়

মুনশী সলিমউল্লাহর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তিনি কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের শাসনকর্তা হেনরি ভেন্সিস্টার্টের অধীনে চাকরি করতেন। তারই নির্দেশে তিনি ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে তার এ গ্রন্থ রচনা করেন।

"তারিখ-ই-বাংলা" গ্রন্থের বিষয়বস্তু

তিনি "তারিখ-ই-বাংলায়" বাংলার মোট ৬ জন সুবেদারের ৬০ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেন। এ সুবেদাররা ছিলেন– ইব্রাহীম খান, যুবরাজ মোহাম্মদ আযিম-উদ-দীন, জাফর খান (মুর্শিদকুলী খান), সরফরাজ খান, সুজা-উদ-দীন মোহম্মদ খান ও আলীবর্দী খান। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বাংলার নাজিম ও তার কর্মচারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মুর্শিদকুলী খানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু, অত্যাচারী জমিদার কর আদায় কারীদের উপর মুর্শিদকুলী খান কঠোর নীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি নবাব আলীবর্দী খানের মারাঠাবর্গী দমনের সময় সিরাজ-উদ-দৌলার কথাও বলেছেন। তিনি বাংলার নবাবদের বিপর্যয়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অবস্থা, ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

বাংলার (১৬৯৬ – ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে) পর্যন্ত এ ৬০ বছরের ইতিহাস মুনশী সলিমউল্লাহ তার "তারিখ-ই-বাংলায়" আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থের তিনি ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু তারিখ উল্লেখ করেননি। তিনি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। তিনি ভেনসিস্টার্টের অনুরোধে এ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় তার এ গ্রন্থকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. "ইতিবৃত্ত" হিরোডোটাস (অনু. শাহেদ আলী) ঢাকা-২০০৭।

২. "আল-মুকাদ্দিমা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড" ইবনে খালদুন (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী) ঢাকা-২০০৭।

৩. "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক" মমতাজুর রহমান তরফদার ঢাকা-১৯৯৫।

৪. "লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব ইবনে খালদুন" মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান" (অনু. ইফতেখার আমিন) ঢাকা-২০০৪।

৫. "মুসলিম মনীষা" আবদুল মওদুদ ঢাকা-২০০৮।

৬. "বাবর নামা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)" (অনু প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ), ঢাকা-২০০৪।

৭. "তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত সম্রাট হুমায়ুনের কাহিনী" জওহর আফতাবচী (অনু. চৌধুরী শামসুর রহমান) ঢাকা-২০০২।

৮. "আইন-ই-আকবরী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)" আবুল ফজল আল্লামী (অনু. আহমদ ফজলুর রহমান) ঢাকা-২০০৮।

৯. "হুমায়ুন নামা" গুলবদন বেগম (অনু. মোস্তফা হারুন) ঢাকা-১৯৮৯।

১০. "আল-বেরুনীর ভারত তত্ত্ব"-আল বেরুনী (অনু আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ) ঢাকা-২০০৪।

১১. "হিউয়েন সাঙ ভ্রমণ কাহিনী" ভাষান্তর : খুররম হোসাইন ঢাকা-২০০৩।

১২. "তবকাত-ই-নাসিরী" মীনহাজ-ই-সিরাজ (অনু.আ.ক.ম যাকারিয়া) ঢাকা-০০৭।

১৩. "মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী" ভাষান্তর : খুররম হোসাইন ঢাকা-২০০৪।

১৪. "বাহারীস্তান-ই-গায়বী "মীর্জা নাথান (অনু.খালেকদাদ চৌধুরী) ঢাকা-২০০৪।

১৫. "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী" (অনু-সুধা বসু) কোলকাতা-১৯৯৪।

১৬. "বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীন)' গোলাম হোসেন সলিম (অনু. আকবর উদ্দীন) ঢাকা-২০০৮।

১৭. "আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী" আবুল ফজল (অনু. পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়) ঢাকা-২০০৮।

১৮. "সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন" সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি (অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) ঢাকা-২০০৬।

১৯. "সুলতান ফিরজ শাহ তুঘলক বিরচিত ফুতুহাত-ই-ফিরজ শাহী "(অনু আবদুল করিম) ঢাকা-১৯৮৯।

www.pathagar.com

২০. "ফুতুহুল বুলদান" আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী (র)" (সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ঢাকা-১৯৯৮।

২১. "সীরাতুন নবী (সা) প্রথম খণ্ড" ইবনে হিশাম (অনু. সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ঢাকা-২০০৮।

২২. "সীরাতুন নবী (সা) দ্বিতীয় খণ্ড "ইবনে হিশাম (অনু সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ঢাকা-২০০৭।

২৩. "সীরাতুন নবী (স) তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)" ইবনে হিশাম (অনু. সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ) ঢাকা-২০০৮।

২৪. "তারিখ ই-ফিরুজশাহী" জিয়াউদ্দিন বারানী (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী) ঢাকা-১৯৮২।

২৫. "ইবনে বতুতার সফর নামা" (অনু. মোহাম্মদ নাসির আলী) ঢাকা-২০০২।

২৬. "সিরাসত নামা" নিজাম-উল-মুল্ক (অনু. যাহিদ হোসেন) ঢাকা-১৯৯৩।

২৭. "শেরশাহ" আব্বাস সারওয়ানী (ভাষান্তর : সাদিয়া আফরোজ) ঢাকা-২০০৭।

২৮. "ফতেহনামা মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান" (অুন. মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ) ঢাকা-২০১০।

২৯. "মোজাফফর নামা ও নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খান)" করম আলি খান ও আজাদ-আল-হোসায়নি (অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) ঢাকা-১৯৯৮।

৩০. "তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী" ইউসুফ আলী খান (অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) ঢাকা-১৯৯৭।

৩১. "তারিখে জালালি (সুহেল ইয়ামন)" মৌলভী নাসির উদ্দিন হায়দার (অনু. মোস্তাক আহমাদ দীন) ঢাকা-২০০৩।

৩২. "আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গোলাম সামদানী কোরায়শী ঢাকা-১৯৭৭।

৩৩. "আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঢাকা-২০১০।

৩৪. "প্রযুক্তির জনকেরা" নাসরীন মুস্তফা ঢাকা-২০০৯।

৩৫. "আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" আ. ত. ম. মুছলেহ্ উদ্দীন ঢাকা-২০০৯।

৩৬. "চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান " ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ও মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। ঢাকা-২০১০।

৩৭. "হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস" মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র) ঢাকা-২০০৮।

৩৮. "হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত" ড. আহসান সাইয়েদ ঢাকা-২০০৮।

৩৯. "হাদীস সংকলনের ইতিহাস" মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঢাকা-২০০৭।

৪০. "কুরআন সংকলনের ইতিহাস " মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ ঢাকা-২০০০।

www.pathagar.com

৪১. "বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম" ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (অনু. মোঃ রেজাউল করিম) ঢাকা-১৯৯৭।

৪২. "আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান" বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী ঢাকা-২০০৮।

৪৩. "ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ" গাজী শামছুর রহমান ঢাকা-২০১১।

৪৪. "ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-২০০৯।

৪৫. "বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান" মুহাম্মদ নুরুল আমীন ঢাকা-২০০৮।

৪৬. "জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান" মোহাম্মদ সাদাত আলী ঢাকা-২০০৮।

৪৭. "বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান" নুরুল হোসেন খন্দকার ঢাকা-২০০৯।

৪৮. "ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান" নাফিস আহমদ (অনু. নজরুল ইসলাম ও জামাল খান) ঢাকা-১৯৯৪।

৪৯. "আরব জাতির ইতিহাসচর্চা" ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী ঢাকা-২০০৮।

৫০. "আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" আর. এ. নিকলসন (অনু. জয়ন্ত সিংহ. মুহাঃ আবদুল কাইউম, বিদ্যুৎ ব্যানার্জি ও সৌমিত্র সেনগুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩।

৫১. "আরব জাতির ইতিহাস" ফিলিপ, কে হিট্টি (অনু. জয়ন্ত সিং, সেঁজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত) কোলকাতা-২০০৩।

৫২. "সোস্যাল ষ্ট্রাকচার অব ইসলাম." রুবেন লেভী (অনু. ড. গোলাম রসুল) কোলকাতা-২০০৩।

৫৩. "আরব জাতির ইতিহাস " সৈয়দ আমীর আলী (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ) ঢাকা-১৯৯৫।

৫৪. "মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা (খিলাফত ও ভারত উপমহাদেশ) " ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সাহেলহ ঢাকা-২০০৮।

৫৫. "মুসলিম ইতিহাসচর্চা তত্ত্ব" ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা-২০০৮।

৫৬. "মুসলিম ইতিহাসচর্চা " ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল ঢাকা-২০০৬।

৫৭. "সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা" (অনু. আনিস সিদ্দিকী) ঢাকা-২০০৯।

৫৮. "ইসলামী বিশ্বকোষ" (১-২৬ খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদনা পরিষদ ঢাকা।

৫৯. "সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স)" ইবনে ইসহাক (অনু-শহীদ আখন্দ), ঢাকা-২০০২।

www.pathagar.com

www.pathagar.com